وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘সূর্য কখনো কোনো মানুষের জন্য থেমে যায়নি, একমাত্র ইউশা ইবনু নূনের জন্য কিছু সময় ছাড়া- যখন তিনি বায়তুল মাক্বদিস বিজয় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৯৮; সনদ ছহীহ)।

● ৮ম বর্ষ ● ১ম সংখ্যা ● নভেম্বর ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

■ সম্পাদকীয়

বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার কোন পথে?

■ ইতিহাসের পাতা থেকে

জেরুযালেম ও বায়তুল মাক্বদিস : ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٨، ربيع الثاني و جمادى الأول ١٤٤٥هـ/ نوفمبر ٢٠٢٣م العدد: ١، الجزء: ٨٥
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

প্রচ্ছদ পরিচিতি

মাসজিদুল আক্বছা, আল-কুদস, ফিলিস্তীন : মাসজিদুল আক্বছা বা বায়তুল মাক্বদিস বর্তমানে অবৈধ দখলদার ইসরাঈল কর্তৃক দখলকৃত ফিলিস্তীনের রাজধানী আল-কুদস (জেরুজালেম) শহরে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ (মক্কার মাসজিদুল হারাম) নির্মাণের ৪০ বছর পর মাসজিদুল আক্বছা নির্মিত হয় (ছহীহ বুখারী, হা/১০৪৮)। মাসজিদুল হারাম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় মাসজিদুল আক্বছা বা দূরবর্তী মসজিদ বলা হয়। মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা এই পবিত্র মসজিদ থেকেই রাসূল ﷺ মে'রাজে গমন করেন। এই মসজিদে ছালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলত (এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের সমান ছওয়াব) রয়েছে (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৩৪৩)। নবী ইয়াকূব আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীতে নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম এটার সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পুরো বায়তুল মাক্বদিস এলাকা মুসলিমদের অধীনে আসে। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করার পর মসজিদটিকে একটি প্রাসাদ এবং একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত কুব্বাতুস সাখরা বা টেম্পল মাউন্টকে গির্জা হিসেবে ব্যবহার করত। এরপর ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর, শুক্রবার সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (রহি.) জেরুজালেম শহর পুনরুদ্ধার করেন এবং তা মুসলিমদের অধীনেই ছিল। অতঃপর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মাধ্যমে ব্রিটেনের মদদে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বায়তুল মাক্বদিস ধীরে ধীরে মুসলিমদের একক কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের ৫ থেকে ১০ জুন আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর পুরো জেরুজালেমে বাস্তব নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠা করে ইসরাঈল। অদ্যাবধি মসজিদটি তাদের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। আয়তাকার মসজিদ ও এর পরিপার্শ্ব মিলিয়ে আয়তন ১,৪৪,০০০ বর্গমিটার, তবে শুধু মসজিদের আয়তন প্রায় ৩৫,০০০ বর্গমিটার এবং ৫০০০ মুছল্লী ধারণ করতে পারে। মসজিদ ২৭২ ফুট দীর্ঘ ও ১৮৪ ফুট প্রশস্ত। সম্মুখবর্তী কুব্বাতুস সাখরায় ধ্রুপদি বাইজেন্টাইন স্থাপত্য দেখা গেলেও মাসজিদুল আক্বসায় প্রথম দিকের ইসলামী স্থাপত্যশৈলি দেখা যায়।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৫ || ঈসায়ী ২০২৩ || বঙ্গীয় ১৪৩০

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ নভেম্বর	১৬ রবী.আখের	বুধবার	৪.৪৮	৬.০৪	১১.৪২	২.৫৫	৫.২০	৬.৩০
০৫ ,,	২০ রবী.আখের	রবিবার	৪.৪৯	৬.০৬	১১.৪২	২.৫৪	৫.১৮	৬.৩৪
১০ ,,	২৫ রবী.আখের	শুক্রবার	৪.৫২	৬.০৯	১১.৪২	২.৫২	৫.১৫	৬.৩২
১৫ ,,	৩০ রবী.আখের	বুধবার	৪.৫৫	৬.১২	১১.৪৩	২.৫১	৫.১৩	৬.৩১
২০ ,,	০৩ জুমা. উলা.	সোমবার	৪.৫৮	৬.১৬	১১.৪৪	২.৫০	৫.১২	৬.৩০
২৫ ,,	০৮ জুমা. উলা.	শনিবার	৫.০০	৬.১৯	১১.৪৫	২.৫০	৫.১১	৩.৩০

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	০
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-২
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০
গোপালগঞ্জ	+১	+১	+৩
মাদারীপুর	০	০	+২
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+২
শরিয়তপুর	-১	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	+১	-১
শেরপুর	+২	+৩	০
জামালপুর	+২	+৩	+১
নেত্রকোনা	+১	০	-২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-৪
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৭	-৮	-৫
রাঙ্গামাটি	-৮	-৯	-৫
বান্দরবান	-৯	-১০	-৫
কুমিল্লা	-৪	-৪	-২
নোয়াখালী	-৪	-৪	-১
লক্ষীপুর	-২	-২	০
চাঁদপুর	-২	-২	০
ফেনী	-৫	-৬	-২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৬	-৫	-৭
সুনামগঞ্জ	-৪	-৩	-৫
মৌলভীবাজার	-৬	-৫	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮
নাটোর	+৬	+৬	+৬
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২
বগুড়া	+৪	+৫	+৩
নওগাঁ	+৬	+৭	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৫	+৬	+৩
দিনাজপুর	+৮	+৯	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৫	+২
কুড়িগ্রাম	+৪	+৫	+১
লালমনিরহাট	+৫	+৫	+২
নীলফামারী	+৭	+৮	+৫
পঞ্চগড়	+৯	+৯	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৯	+৯	+৬

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+২	+৫
বাগেরহাট	+৩	+১	+৪
সাতক্ষীরা	+৪	+৪	+৭
যশোর	+৪	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৫	+৭
ঝিনাইদহ	+৪	+৪	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৮
মাগুরা	+৩	+৩	+৪
নড়াইল	+৩	+৩	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-১	+২
পটুয়াখালী	-১	-১	+২
পিরোজপুর	০	০	+৩
ঝালকাঠি	০	-১	+২
ভোলা	-২	-২	০
বরগুনা	০	-১	+৩

৮ম বর্ষ
১ম সংখ্যা

নভেম্বর ২০২৩
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩০
রবীউন আখের-জুমাদাল উলা ১৪৪৫

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◈ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◈ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◈ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো.আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◈ তরিকুল ইসলাম ◈ আল আমিন
◈ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী ০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর ০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল ০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন প্রশান্তিময় জীবন লাভের অন্যতম উপায় ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» কার সাথে পর্দা করবেন? (পর্ব-২) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» গোপন পাপ : ভয়াবহতা ও পরিত্রাণের উপায় ০৯
-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ
» কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা (পর্ব-৫) ১২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» ইসলামে দলীলের প্রয়োজনীয়তা : ছূফী-সুন্নীর প্রেক্ষিতসহ ১৫
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী
» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার (পর্ব-৬) ১৭
মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন
» তাক্বওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম ১৯
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
» দুর্নীতির ভয়াবহতা ২১
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» রাসূল ﷺ -এর চরিত্র মাধুরী ২৩
-নাজমুল হাসান সাকিব
» আদর্শ দাঈর গুণাবলি ২৫
-আব্দুল কাইয়ূম বিন জাহাঙ্গীর আলম
» মানবদেহের সৃষ্টি রহস্য ২৭
-মো. হারুনুর রশীদ

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব ৩০
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ দিশারী
» তারা কেন নাস্তিক? ৩৩
-সাঈদুর রহমান

◈ জামি'আহ পাতা
» দ্বীনী জ্ঞানার্জন থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ ৩৬
-আহমাদুল্লাহ

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে
» জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা ৩৮
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» তওবা : ফিরে আসার গল্প ৪১
-ওমর বিন শফিক

◈ কবিতা ৪২
◈ সংবাদ ৪৩
◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার কোন পথে?

প্রায় ৫০ বছর আগে ইসরাঈলের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছিল মিসর ও সিরিয়া। দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তীনীদের উপর চালানো নৃশংসতার জবাবে একই উপায়ে ৭ অক্টোবর'২৩ শনিবার সকালে ইসরাঈলে নজিরবিহীন হামলা চালায় হামাস। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হামাস হাজার হাজার রকেট ছোড়ে, যা ইসরাঈলের উন্নত আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। এর জবাবে গাজায় জ্বালানি, বিদ্যুৎ, খাবার, পানি ও মানবিক সহায়তা বন্ধের পাশাপাশি অব্যাহত হামলা চালায় ইসরাঈল। ফলে হামাসের হামলায় ইসরাঈলে নিহতের সংখ্যা ১ হাজার ৪০০ ছাড়ায়। এছাড়া ১২০ জনেরও বেশি ইসরাঈলীকে যিম্মী করে হামাস। অপরদিকে ইসরাঈলের বিমান হামলায় ২ হাজার ৪৫০ ফিলিস্তীনী প্রাণ হারায়। পাশাপাশি আহতের সংখ্যা ৯ হাজার ২০০ জনে পৌঁছে।

বায়তুল মাক্বদিসকে ঘিরে লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরনো। এটিকে যত ধর্মযুদ্ধ ও রক্তপাত হয়, তা পৃথিবীর আর কোনো ভূখণ্ড নিয়ে বা ভূখণ্ডে হয় না। একে ঘিরেই খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে ১৬টি ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের একটা বৃহৎ ভূখণ্ড অশান্ত হয়ে রয়েছে বিগত ৭৫ বছরের উপর। এ অশান্তির সূচনা হয় ১৯৪০ সালে, যখন চূড়ান্তভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সরকার ১৯১৭ সালের এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে— যা ইতিহাসে 'বেলফোর ডিক্লারেশন' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের জন্য ব্রিটিশদের দখলকৃত ফিলিস্তীনে রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর সব ধরনের বাধা উপেক্ষা করে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে ডেভিড বেন গোরিয়ন ইসরাঈলী রাষ্ট্রের ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণাপত্রে ফিলিস্তীনকে বিভক্ত করে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র ইয়াহূদী এবং ফিলিস্তীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। প্রথমেই এ ইয়াহূদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাঈলের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা এবং জাতিসংঘের হঠকারিতা মেনে নিতে পারেনি ঐ সময়ের আরব রাষ্ট্রগুলো, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিমপ্রধান দেশ ও জনগোষ্ঠী।

আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম বায়তুল মাক্বদিস নির্মাণ করেন। এরপর ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, সুলায়মান আলাইহিমুস সালাম সহ আরো কতিপয় নবী এর সংস্কারকাজ করেন। বায়তুল মাক্বদিস নবী-রাসূলগণের পদভারে মুখরিত পুণ্যভূমি। এ স্থানটি সর্বযুগে মুসলিমদের অধিকারে ছিল; শুধু কিছুকাল ছাড়া— যখন রক্তপিপাসু ও দুর্বৃত্তরা তা জবরদখল করেছিল। এদের কারো কারো কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন- 'প্রবল শক্তিশালী এক জাতি', 'জালূত এবং তার সৈন্যবাহিনী' *(দ্র. আল-বাক্বারা, ২/২৫১; আল-মায়েদা, ৫/২২)*। অনুরূপভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ সালে রোমানরা তা দখল করে নিয়েছিল। এরপর ইউরোপীয় ক্রুশধারীরা ৪৯২ থেকে ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তা জবরদখল করে রেখেছিল। সর্বযুগে যখনই জবরদখলকারীরা সেটা দখল করেছে, তখনই মুসলিমরা তা পুনরুদ্ধার করেছে, আল-হামদুলিল্লাহ।

ইতিহাস প্রমাণ করে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের ৬ হাজার বছর পূর্বে সর্বপ্রথম আরবের কিনআন গোত্র সর্বপ্রথম ফিলিস্তীনে বসবাস করেছিল এবং তাদের নামেই 'ফিলিস্তীন' নামকরণ করা হয়েছিল। অথচ ইয়াহূদীরা সেখানে প্রবেশ করেছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর প্রবেশের প্রায় ৬শ' বছর পরে। অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের প্রায় ১৪শ' বছর পূর্বে তারা সেখানে প্রবেশ করেছিল। তার মানে ইয়াহূদীদের ফিলিস্তীনে প্রবেশের প্রায় ৪ হাজার ৫শ' বছর পূর্বে কিনআন আরবরা সেখানে প্রবেশ করেছিল।

তাছাড়া ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, দাঊদ, সুলায়মান, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালাম সহ সকল নবীর ধর্মই ছিল ইসলাম, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম এবং তাঁরা সবাই ইসলামের দিকেই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ খ্রিষ্টানও ছিলেন না, ইয়াহূদীও ছিলেন না *(দ্র. আল-বাক্বারা, ২/১২৪, ১২৮, ১৩০-১৩৩, ১৪০; আলে ইমরান, ৩/৬৭-৬৮; ইউনুস, ১০/৮৪; আন-নামল, ২৭/২৯-৩১; হূদ, ১১/৪৬)*। সুতরাং মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো ইয়াহূদ, নাছারা বা আর কোনো কাফের-মুশরিক কোনো দিক দিয়েই নবীগণের ওয়ারিশ হতে পারে না, যদিও তারা কোনো নবীর বংশধর হয়। কারণ নবী-রাসূলগণ ছিলেন মুসলিম আর এরা হচ্ছে কাফের। আর কস্মিনকালেও কোনো কাফের কোনো মুসলিমের উত্তরাধিকারী হতে পারে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৬১৪)*। সেজন্য নবী-রাসূলগণের একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছেন মুসলিমরা। আল্লাহ বলেন, 'মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্টতম' *(আলে ইমরান, ৩/৬৮)*। **অতএব, একথা হলফ করে বলা যায় যে, ইয়াহূদীরা জবরদখলদার এবং ইসরাঈল সম্পূর্ণ অবৈধ রাষ্ট্র।**

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়)

সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন প্রশান্তিময় জীবন লাভের অন্যতম উপায়

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».

সরল অনুবাদ : হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে মুখস্থ করেছি, ‘যে কাজ তোমার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে তা বর্জন করে ঐ কাজ করো, যা তোমার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে না’।

হাদীছটির অবস্থান : উক্ত হাদীছটি দ্বীনের অন্যতম ভিত্তি। এটি আল্লাহভীতির এমন উৎস, যার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত। এটি এমন সন্দেহ ও বিভ্রমের অন্ধকার থেকে নিষ্কৃতি দেয়, যা নিশ্চিত আলোর প্রতিফলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[২] উক্ত হাদীছটি মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপক অর্থবোধক বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এটি অলংকারপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অন্যতম নবুঅতী জ্ঞান। সংক্ষিপ্ত বাণীর মাধ্যমে তিনি আমাদের দ্বীন ইসলামে একটি মহান নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর তা হলো সন্দেহ বর্জন করা এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হালালকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।[৩] আসকারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি উক্ত হাদীছ নিয়ে গবেষণা করে, তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবে এই জ্ঞান অর্জন করবেন যে, সন্দেহজনক বিষয় থেকে বাঁচার জন্য যত নির্দেশনা এসেছে, তার সব কয়টিকে এটি অন্তর্ভুক্ত করে।[৪]

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা তাঁর উম্মতকে জীবিকা অর্জন ও কল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য উত্তম পথ অবলম্বনের উপদেশ দিতেন। তিনি তাদেরকে সৎ পথে চলার পরামর্শ দিতেন। তিনি তাদেরকে সৎ পথের বৈশিষ্ট্য এবং সৎ পথের দিকে চালিত করে এমন সব উপায়ের কথা বলে দিয়েছেন। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক উপদেশের অন্যতম হলো এ হাদীছ। হাদীছটিতে মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে সন্দেহজনক বিষয় বর্জন করার এবং স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বৈধ বিষয় অবলম্বন করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

হাদীছটির বর্ণনাকারীর পরিচয় : হাসান ইবনু আলী ইবনে আবী তালেব (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ছিলেন ইমাম ও সরদার। তিনি হলেন জান্নাতের যুবকদের নেতা। তার উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ আল-কুরাশী। তিনি মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর সন্তান। তিনি তৃতীয় হিজরীর শা‘বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ কলেন, তিনি মধ্য রামাযানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভাই হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর চেয়ে এক বছরের বড়। তিনি ২৫ বার হজ্জ করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হিজাজ, ইয়ামান, ইরাক ও খোরাসানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর খেলাফতের ব্যাপ্তিকাল ছিল ছয় মাস। আত্মমর্যাদাবোধ, মহানুভবতা ও উদারতার কারণে মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরামর্শে মুআবিআ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তিনি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ১৩টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ৫০ বছর বয়সে বিষপানে তাঁর মৃত্যু হয়। যখন তাঁর সাত বছর বয়স, তখন মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স অল্প হওয়ায় তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম। এই হাদীছটি তাঁর বর্ণিত হাদীছের অন্যতম।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীছটি এই বলে শুরু করেছেন, ‘বর্জন করো, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে’, একটি সাধারণ আদেশ যা বান্দাকে সন্দিগ্ধ করে এমন সব বিষয়ের বর্জনকে শামিল করে। এখানে ‘রায়ব’ বলতে সন্দেহকে বোঝানো হয়েছে। যেমন রায়ব শব্দটি সন্দেহ অর্থে আল-কুরআনে ব্যবহৃত

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. তিরমিযী, হা/২৫১৮, হাদীছ ছহীহ; আহমাদ, হা/১৭২৩; নাসাঈ, হা/৫৭১১; মিশকাত, হা/২৭৭৩।
২. মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ আল-মুনাবী, ফায়যুল ক্বাদীর শারহুল জামে‘ আছ-ছাগীর, পৃ. ৩/৭০৬; ফাতহুল মুবীন, পৃ. ১২৬।
৩. মুছত্বফা আল-বাগা, আল-ওয়াফী ফী শারহিল হাদীছ আল-আরবাঈন, পৃ. ৮৫।
৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-জুরযানী, আল-জাওয়াহিরুল লুলুআহ ফী শারহিল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ১১৬; ফায়যুল ক্বাদীর শারহুল জামে‘ আছ-ছাগীর, ৩/৭০৭।
৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা, ১/৩২৮।

হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ‘এই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই’ *(আল-বাক্বারা, ২/২)*।

হাদীছটি আমাদেরকে যা সন্দেহ সৃষ্টি করে, তা বর্জন করার এবং যা স্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত, তা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলেমগণ সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করার আদেশের তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। তারা বলেছেন, এই আদেশ কি বাধ্যতামূলক? অর্থাৎ বান্দা যদি সন্দেহজনক বিষয় বর্জন না করে, তবে সে গুনাহগার হবে নাকি বর্জনের আদেশ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল?

উক্ত হাদীছ ও হাদীছের অর্থে বর্ণিত অন্যান্য হাদীছ নিয়ে ভাবলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছগুলোতে সন্দেহজনক বিষয় সম্পর্কে ভাবার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে প্রকৃত অর্থে ‘আমর’ (আদেশ) বলতে কোনো বিধান সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান এবং শারঈ বৈধতাপ্রাপ্ত বিষয়ের বর্ণনা করা। কারণ, ইবাদত, লেনদেন এবং অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন একজন ব্যক্তিকে ধর্মভীরুতা ও তাক্বওয়া অর্জন এবং দ্বীনী পরিবেশ ও সম্ভ্রম রক্ষার দিকে পরিচালিত করে। যেমন নু‘মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মানুষ এ ক্ষেত্রে সবাই একই পর্যায়ের নয়। যখন কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে সন্দেহ যুক্ত হয় কিংবা এমন ধারণা জন্ম নেয় যে, কাজটিতে জড়ালে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসন্তুষ্ট হবেন, তবে এমন অবস্থায় বান্দাকে অবশ্যই সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করতে হবে।

মোদ্দাকথা, যখন কারও নিকট দু’টি বিষয় উপস্থিত হবে। তার মধ্যে একটির হালাল হওয়া বৈধ আর অপরটি অস্পষ্ট, তখন সতর্কতাস্বরূপ সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করতে হবে। প্রকাশ্য বিষয় অনুযায়ী আমল করতে হবে, যেখানে সন্দেহ সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। সেটা সম্পদ হোক, পোশাক হোক, সঙ্গ অবলম্বন করা হোক বা অন্য কিছু হোক। সুতরাং যে বিষয়ে হারামের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় তা বর্জন করতে হবে।

দীপ্ত সত্যের মূর্ত প্রতীক আমাদের সালাফের অনেক চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি এবং উজ্জ্বল বাণী রয়েছে, যা তাদের নৈতিকতার ভূষণে অলংকৃত এবং আল্লাহভীতির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ প্রসঙ্গে তাদের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বাণী রয়েছে। তার মধ্যে আবূ যার আল-গিফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ‘তাক্বওয়াপূর্ণ জীবনের চূড়ান্ত রূপ হলো, হারাম থেকে বাঁচার তাগিদে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কিছু হালাল বর্জন করা’।[৬] ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন, ‘লোকেরা বলে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাক্বওয়ার অবলম্বন সবচেয়ে কঠিন বিষয়। কিন্তু যখন আমি দুইটি অবস্থার সম্মুখীন হই, তখন কঠিনটা গ্রহণ করি। কারণ আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তুমি সন্দেহের উদ্রেক করে এমন বিষয় বর্জন করো এবং এমন অবস্থা অবলম্বন করো, যা তোমাকে সন্দেহমুক্ত রাখে’।[৭]

তাঁদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহভীতির নিদর্শন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। হাদীছে এসেছে, আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর একজন কৃতদাস ছিলেন, যিনি চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ধার্যকৃত কর আদায় করতেন। আর আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার সেই আদায়কৃত অর্থ ভক্ষণ করতেন। কৃতদাসটি একদিন তার কাছে কিছু খাবার নিয়ে আসলে তিনি সেখান থেকে খেলেন। তখন কৃতদাসটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন এটা কেমন খাদ্য? তিনি বললেন, আমি জাহেলী যুগে একজন ব্যক্তির ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, অথচ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। তিনি আমার সাথে দেখা করে এ খাদ্য দিয়েছিলেন, যা থেকে আপনি খেয়েছেন। আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মুখে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং সেই খাদ্য পেট থেকে বমি করে ফেলে দিলেন।[৮]

আমাদের পূর্ববর্তীদের জীবন কতটা তাক্বওয়াপূর্ণ ছিল তা তাঁদের জীবনচরিত থেকে জানা যায়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে একটি জমি ক্রয় করেছেন। জমিক্রেতা তার ক্রয়কৃত জমিতে একটি পাত্র পেয়েছেন, যাতে স্বর্ণ রয়েছে। জমির ক্রেতা বিক্রেতাকে বললেন, ‘আপনি আমার থেকে আপনার স্বর্ণ নিয়ে নিন। কেননা আমি আপনার কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। আর জমির মালিক বললেন, আমি আপনার নিকট জমি ও তাতে যা আছে সবকিছুই আপনার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।

৬. আবূ হামিদ আল-গাযালী, এহয়াউ উলূমিদ্দীন, ২/১০৮।
৭. হাফেয ইবনু রজব আল-হাম্বালী, জামেউল উলূম ওয়াল-হিকাম, পৃ. ১৩১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮৪২।

অবশেষে তারা দু'জনে এক ব্যক্তির নিকট ফয়সালার জন্য গেলেন। অতঃপর যার কাছে ফয়সালার জন্য গিয়েছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দু'জনের কোনো সন্তান আছে? তাদের মধ্যে একজন বললেন, আমার একজন পুত্র সন্তান আছে। আর অপরজন বললেন, আমার একজন কন্যা সন্তান আছে। তিনি বললেন, ছেলেটিকে মেয়েটির সাথে বিবাহ দিয়ে দাও এবং তাদের জন্য এই স্বর্ণ ব্যয় কর এবং ছাদাক্বা করো'।[৯]

সুফিয়ান ছাওরীকে স্বপ্নে দেখা গেল। তাঁর দুটি ডানা রয়েছে যা দিয়ে তিনি জান্নাতে উড়ছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কীভাবে এটি পেয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি গভীর ভয় থেকে আমি এটি পেয়েছি।[১০]

ফিক্বহশাস্ত্রবিদগণ এই হাদীছটির গবেষণায় যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। উক্ত হাদীছ থেকে তারা ফিক্বহশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের করেছেন, যা শারঈ আইনের অধিকাংশ মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। উক্ত মূলনীতি হলো 'নিশ্চিত জিনিস সন্দেহের কারণে লোপ পায় না'। তাই আমরা সন্দেহ বর্জন এবং দৃঢ়বিশ্বাস গ্রহণের নীতি অবলম্বন করব। এই মূলনীতির উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে বুঝাতে আমাদের উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যক্তির ওযূ নষ্ট হয়, অতঃপর তার আবার সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ওযূ ভঙ্গের পর সে কি পবিত্রতা অর্জন করেছে, না-কি করেনি? এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো যে তার ওযূ ভেঙে গেছে এবং সে এরই উপর আমল করবে। (অর্থাৎ) পূর্ববর্তী মূলনীতির আলোকে সে ছালাত পড়তে চাইলে তার ওযূ করা ওয়াজিব। আর একইভাবে যদি সে ওযূ করে অতঃপর তার সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ওযূ করার পর তার কি ওযূ ভেঙেছে, না-কি না? তখন মূলনীতি হলো এই যে, তার ওযূ বলবৎ আছে। কারণ, তার ওযূ করাটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত আর ওযূ ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহজনক। কাজেই তাকে নিশ্চয়তার উপর আমল করতে হবে।[১১]

আলোচ্য হাদীছের আরও একটি অংশ রয়েছে, যা অন্যান্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সুনানে তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, 'সততা হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সন্দেহ'।[১২] হাদীছের এই অংশ এই ইঙ্গিত দেয় যে, যদি কোনো মুসলিম সন্দেহ সৃষ্টি করে এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকে, তবে (মনে করতে হবে) হারামে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে সে সব থেকে অগ্রগামী পন্থা অবলম্বন করেছে। এটি মনে প্রশান্তি এনে দেয় এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। আর যদি সে নবী ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসরণ না করে এবং সন্দেহের পথ থেকে দূরে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে এবং অস্থিরতায় ভুগবে। কেননা সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির স্বভাব এমন যে, তার হৃদয় কখনোই প্রশান্তি অর্জন করে না এবং তার বিবেক স্বস্তির পথ খুঁজে পায় না। অন্য এক হাদীছে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'একজন মানুষের সুন্দর ইসলামের অনুসারী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, অনর্থক বিষয় বর্জন করা। যার কোনো অর্থ নেই, যাতে কোনো কল্যাণ নেই, যার কোনো গুরুত্ব নেই, তা বর্জন করাই হলো সুন্দর ইসলাম। অনর্থক বস্তু ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামে ঐসব বিষয়ের আলোচনা স্থান পায়, যা অর্থবহ। যার কোনো অর্থ নেই বা যাতে কল্যাণ নেই তাতে জড়ানো একজন মুসলিমের জন্য কোনো অবস্থাতেই শোভা পায় না।

পরিশেষে একথা বলা যায়, বান্দার গ্রহণ এবং বর্জন সম্পর্কিত স্পষ্ট বিধান উক্ত হাদীছে অঙ্কিত হয়েছে। হাদীছটির আলোচ্য বিষয় আত্মার স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের প্রশান্তিকে কতটা প্রভাবিত করে তার একটি স্পষ্ট চিত্র এখানে দেওয়া হয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট চাই, তিনি যেন আল্লাহভীরুতা ও ধার্মিকতার চূড়ান্ত আসনে আমাদের সমাসীন করান। তিনিই আমাদের আত্মার একমাত্র অভিভাবক এবং তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। আল্লাহ আমাদের সকলকে হারাম থেকে বেঁচে আত্মা নিয়ন্ত্রণের শক্তি দান করুন- আমীন!

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭২১।
১০. আব্দুল হক্ব আল-ইশবীলী, আল-আক্বিবাতু ফী যিকরিল মাউত, পৃ. ২২৩।
১১. মুহাম্মাদ ছিদ্দীক্বী, কিতাবুল ওয়াজীয ফী ক্বাওয়ায়েদিল ফিক্বহ আল-কুল্লিয়্যা, পৃ. ১৬৬।
১২. তিরমিযী, হা/২৫১৮; আহমাদ, হা/১৭২৩; নাসাঈ হা/৫৭১; মিশকাত, হা/২৭৭৩, হাদীছ ছহীহ।

কার সাথে পর্দা করবেন?

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-২)

মাহরাম নারীগণ

স্থায়ী মাহরাম:

(ক) বংশসূত্রে স্থায়ী মাহরাম নারীগণের বিবরণ:

বংশীয় নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে যেসব নারীর সাথে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহবন্ধন হারাম, তারাই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তারা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

প্রথম প্রকার: ব্যক্তির জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় বা বংশ সম্বন্ধীয় মাহরাম

কারো জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় মাহরাম বলতে সেসব নারী উদ্দেশ্য, যাদের থেকে সে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা হচ্ছেন তার 'মূল' (উছূল/أُصُوْلٌ)।

নিচে একজন পুরুষের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় নারী মাহরামগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হলো:

(১) মা: اَلْأُمُّ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لَهَا عَلَيْكَ وِلَادَةٌ 'মা বলতে প্রত্যেক এমন নারীকে বুঝায়, আপনার জন্মে যাদের অংশগ্রহণ রয়েছে', তিনি যত ঊর্ধ্বতনই হন না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক এমন নারীকে মা বলা হয়, যিনি আপনাকে সরাসরি বা মধ্যস্থতায় জন্ম দিয়েছেন। যিনি আপনাকে সরাসরি জন্ম দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আপনার মা। আর যিনি মধ্যস্থতায় জন্ম দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আপনার দাদী ও নানী এবং তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন আপনার দাদী, দাদীর মা, তার মা... এভাবে যত উপরে যাক না কেন এবং নানী, নানীর মা, তার মা... এভাবে যত উপরে যাক না কেন। **সেই হিসেবে মা, দাদী, নানী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ মায়ের শ্রেণিভুক্ত।**[১] মহান আল্লাহ বলেন, ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণকে' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*। 'হারাম করা হয়েছে' অর্থাৎ তাদের সাথে বিবাহবন্ধন চিরস্থায়ীভাবে হারাম করা হয়েছে। আয়াতাংশটিতে মাতাগণ বলতে মা, দাদী, নানী ও ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।[২]

সম্মানিত পাঠক! সূত্রটি ভালোভাবে মনে রাখবেন, আপনার জন্মগ্রহণে যাদের অংশগ্রহণ রয়েছে, কেবল তারাই আপনার মা। অতএব, পাতানো মা, ধর্ম মা, মায়ের মতো, মায়ের বয়সী, দাদী-নানীর মতো ইত্যাদি অজুহাতে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করবেন না।

আরেকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, দাদী, নানী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ যেহেতু মায়ের শ্রেণিভুক্ত, সেহেতু নাতি-নাতনীর পক্ষ থেকে তাদেরকে দাদী আপু, নানী আপু ইত্যাদি সম্বোধন করা বর্জন করা ভালো। অনুরূপভাবে দাদী, নানী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণের পক্ষ থেকে নাতি-নাতনীদেরকে আপা, আপু, বোন ইত্যাদি সম্বোধন করাও এড়িয়ে চলা ভালো। তাছাড়া হাদীছে নাতিকে সন্তান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় নাতি হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সম্পর্কে বলেন, هَذَانِ ابْنَايَ، وَابْنَا ابْنَتِي এরা দু'জন আমার ছেলে এবং আমার মেয়ের ছেলে'।[৩]

দ্বিতীয় প্রকার: ব্যক্তির জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম

কারো জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম বলতে সেসব নারী উদ্দেশ্য, যাদের জন্মদানে তার অংশগ্রহণ রয়েছে। এ শ্রেণিকে একজন ব্যক্তির 'শাখা' (ফুরূ/فُرُوْعٌ) হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

নিচে একজন পুরুষের জন্মদান সম্বন্ধীয় নারী মাহরামগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হলো:

(২) মেয়ে: اَلْبِنْتُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لَكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ 'প্রত্যেক এমন নারীকে মেয়ে বলে, যার জন্মদানে আপনার অংশগ্রহণ রয়েছে'। অথবা, كُلُّ أُنْثَى يَرْجِعُ نَسَبُهَا إِلَيْكَ بِالْوِلَادَةِ بِدَرَجَةٍ أَوْ دَرَجَاتٍ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ بِنْتُ الصُّلْبِ وَبَنَاتُهَا وَبَنَاتُ الْأَبْنَاءِ وَإِنْ نَزَلْنَ 'প্রত্যেক এমন নারীকে মেয়ে বলে, যার বংশীয় ধারা জন্মসূত্রে আপনার দিকে ফিরে— সেই বংশীয় ধারার ব্যবধান এক স্তর পরে হোক বা একাধিক স্তর পরে হোক। সেজন্য, একজন ব্যক্তির মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে এবং তাদের অধস্তন নারীগণ সবাই মেয়ের অন্তর্ভুক্ত'।[৪]

মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ 'আর (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের মেয়েদেরকে' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*। অতএব, পালিত মেয়ে, মেয়ের বান্ধবী, মেয়ের বয়সী, নিজের ছাত্রী, বন্ধুর মেয়ে ইত্যাদি দোহাই দিয়ে মহান আল্লাহর ফরয বিধান অমান্য করার দুঃসাহস দেখাবেন না।

উল্লেখ্য, যেনার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া মেয়ে অর্থাৎ জারজ মেয়ে যেনাকার সেই পুরুষের জন্য হারাম। অর্থাৎ তার সাথে বিবাহবন্ধন হারাম। অনুরূপভাবে লি'আনের পরে জন্ম নেওয়া

বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন (তাফসীর কুরতুবী), সূরা আন-নিসার ২৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৫/১০৮।

২. মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৩৮।

৩. সুনানে তিরমিযী, হা/৩৭৬৯, 'হাসান'।

৪. তাফসীর কুরতুবী, সূরা আন-নিসার ২৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৫/১০৮। স্বামী স্ত্রীকে যেনার অপবাদ দিলে এবং স্ত্রীর গর্ভস্থ ভ্রূণ তার সন্তান হিসেবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে স্বামীকে ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করতে

মেয়ে, যাকে লি'আনকারী পুরুষটি ইতোপূর্বে অস্বীকার করেছে, তাকে বিয়ে করা সেই পুরুষের জন্য হারাম।[৫]

তৃতীয় প্রকার: ব্যক্তির পিতা-মাতার জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম

অর্থাৎ একজন ব্যক্তির পিতা-মাতা যেসব নারীকে জন্ম দিয়েছেন, ঐ ব্যক্তি সেসব নারীর জন্য মাহরাম। আর তারা হচ্ছেন, ঐ ব্যক্তির বোন, বোনের মেয়ে (ভাগনি), ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজি/ভাস্তি/ভাইঝি) এবং তাদের অধস্তন নারীগণ। এ শ্রেণিকে আমরা 'ব্যক্তির পিতা-মাতার জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম' (فُرُوْعُ أَبَوَيِ الرَّجُلِ) হিসেবে অভিহিত করছি।

(৩) বোন: الْأُخْتُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى جَاوَرَتْكَ فِي أَصْلَيْكَ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا 'বোন বলতে প্রত্যেক এমন নারীকে বুঝায়, যে আপনার পিতা-মাতা উভয়ের অথবা দু'জনের যে কোনো একজনের জন্মদানসূত্রে আপনার পাশাপাশি বসবাস করে'। অর্থাৎ সে হচ্ছে আপনার সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন। মহান আল্লাহ বোন সম্পর্কে বলেন, أَخَوَٰتُكُمْ 'আর (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের বোনদেরকে' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*।

অতএব, বোনের সংজ্ঞাটি মনে রাখবেন এবং মামাতো বোন, খালাতো বোন, ফুফাতো বোন, চাচাতো বোন, পাতানো বোন প্রমুখের সাথে পর্দার বিধান মেনে চলবেন। বোনের বান্ধবী, বোনের মতো, পড়শি বোন ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে পর্দার বিধান অমান্য করবেন না। কারণ তারা কেউ আপনার পিতা-মাতার জন্মদান সম্বন্ধীয় বোন নয়। সেজন্যই মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 'হে নবী! আমি আপনার জন্য আপনার স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা দিয়েছেন। আর আল্লাহ আপনাকে ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ মাল) হিসেবে যা দিয়েছেন, তন্মধ্যে যারা আপনার মালিকানাধীন তাদেরকেও আপনার জন্য হালাল করেছি এবং (বিয়ের জন্য বৈধ করেছি) আপনার চাচার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে, মামার মেয়ে ও খালার মেয়েকে, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। আর কোনো মুমিন নারী যদি নবীর জন্য নিজেকে হেবা করে, নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও তার জন্য বৈধ। এটি (শেষোক্তটি) বিশেষভাবে আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আমি তাদের উপর তাদের স্ত্রীদের ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তাদের ব্যাপারে যা ধার্য করেছি, তা আমি নিশ্চয় জানি; যাতে আপনার কোনো অসুবিধা না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫০)*।

(৪) ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজি/ভাস্তি/ভাইঝি): بِنْتُ الْأَخِ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لِأَخِيكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ بِوَاسِطَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةً 'প্রত্যেক এমন নারীকে ভাইয়ের মেয়ে বা ভাতিজি বলে, যার জন্মে আপনার ভাইয়ের সরাসরি বা মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণ রয়েছে'।[৬] অর্থাৎ আপনার ভাইয়ের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ের মেয়ে, ভাইয়ের ছেলের মেয়ে ও তাদের অধস্তন নারীগণ সকলেই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, এখানে ভাই বলতে সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই উদ্দেশ্য।

(৫) বোনের মেয়ে বা ভাগনি সম্পর্কেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যার জন্মে আপনার সহোদরা, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় বোনের সরাসরি বা মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণ রয়েছে, সে-ই বোনের মেয়ে। এই দুই শ্রেণি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ 'আর (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ভাতিজিদেরকে ও ভাগনিদেরকে' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*।

সুতরাং এই সূত্রের বাইরে গিয়ে দূরসম্পর্কের কোনো ভাতিজি বা ভাগনির সাথে চলাফেরায় পর্দার বিধান লঙ্ঘন করবেন না।

চতুর্থ প্রকার: ব্যক্তির দাদা-দাদী ও নানা-নানীর জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম

এখানে দাদা-দাদী ও নানা-নানীর জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম বলতে তাদের কন্যাগণ উদ্দেশ্য। আপনার দাদা-দাদীর কন্যা হচ্ছেন আপনার ফুফু। আর আপনার নানা-নানীর কন্যা হচ্ছেন আপনার খালা।

(৬) ফুফু: الْعَمَّةُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى شَارَكَتْ أَبَاكَ أَوْ جَدَّكَ فِي أَصْلَيْهِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا 'প্রত্যেক এমন নারীকে ফুফু বলে, যারা আপনার বাবার বা দাদার সঙ্গী হয়েছে তাদের পিতা-মাতা উভয়ের

হবে। অন্যথা দণ্ড থেকে বাঁচতে হলে তাকে ৪ বার আল্লাহর কসম করে বলতে হবে যে, সে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলতে হবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত হোক। স্ত্রীও যদি দণ্ড থেতে বাঁচতে চায়, তাহলে তাকেও এরূপ করতে হবে। তবে তাকে পঞ্চমবার বলতে হবে, তার স্বামী যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর অর্থাৎ স্ত্রীর নিজের উপর আল্লাহর গযব হোক। এই নিয়মকে লি'আন বলে।

লি'আনের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যায়; ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ থাকে না। **যে গর্ভাবস্থার কারণে এই লি'আন সম্পন্ন হয়েছে, তাতে যদি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে সে বিবাহের উপযুক্ত হলে তাকে বিয়ে করা ঐ স্বামীর জন্য হারাম।**

৫. বাকর মুহাম্মাদ ইবরাহীম, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৭।

৬. তাফসীর কুরতুবী, সূরা আন-নিসার ২৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৫/১০৮।

জন্মদান সূত্রে অথবা দু'জনের যে কোনো একজনের জন্মদান সূত্রে'।[৭] এভাবেও বলা যেতে পারে, كُلُّ ذَكَرٍ رَجَعَ نَسَبُهُ إِلَيْكَ فَأُخْتُهُ عَمَّتُكَ 'প্রত্যেক এমন পুরুষের বোন আপনার ফুফু, যার বংশসূত্র আপনার দিকে ফিরে'।[৮]

অতএব, এখানে ফুফু বলতে আপন ফুফু, পিতার ফুফু, দাদা-দাদীর ফুফু, মায়ের ফুফু ও নানা-নানীর ফুফু সকলেই উদ্দেশ্য।

(৭) খালা: الْخَالَةُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى شَارَكَتْ أُمَّكَ فِي أَصْلَيْهَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا 'প্রত্যেক এমন নারীকে খালা বলে, যারা আপনার মায়ের সঙ্গী হয়েছে তাদের পিতা-মাতা উভয়ের জন্মদান সূত্রে অথবা দু'জনের যে কোনো একজনের জন্মদান সূত্রে'।[৯] এভাবেও বলা যেতে পারে, كُلُّ أُنْثَى رَجَعَ نَسَبُهَا إِلَيْكَ بِالْوِلَادَةِ فَأُخْتُهَا خَالَتُكَ 'প্রত্যেক এমন নারীর বোন আপনার খালা, যার বংশসূত্র আপনার দিকে ফিরে'।[১০]

অতএব, এখানে খালা বলতে আপন খালা, পিতার খালা, দাদা-দাদীর খালা, মায়ের খালা ও নানা-নানীর খালা সকলেই উদ্দেশ্য।

বুঝা গেল, এখানে 'ব্যক্তির দাদা-দাদী ও নানা-নানীর জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার ফুফু ও খালা। অনুরূপভাবে আপনার বাবার ফুফু ও খালা, আপনার মায়ের ফুফু ও খালা, আপনার দাদা-দাদীর ফুফু ও খালা, আপনার নানা-নানীর ফুফু ও খালা, এভাবে যত উর্ধ্বতনই হোক না কেনো। অনুরূপভাবে ফুফু বা খালা সহোদরাও হতে পারে অথবা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় তথা সৎ ফুফু বা সৎ খালাও হতে পারে।

ফুফু ও খালার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তাদের মাহরাম হওয়ার বিষয়টি কেবল প্রথম স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথম স্তর অতিক্রম করলেই তারা আর আপনার মাহরাম গণ্য হবেন না। যেমন- আপনার ফুফুর মেয়ে তথা ফুফাতো বোন ও আপনার খালার মেয়ে তথা খালাতো বোন আপনার মাহরাম নয়। কেননা তারা আপনার দাদা-দাদী ও নানা-নানীর সূত্রে প্রথম স্তর অতিক্রম করেছে। এটি বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমুখের ফুফু ও খালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১১] মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ 'আর (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ফুফুদেরকে ও খালাদেরকে' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*।

মোদ্দাকথা: ব্যক্তির জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় বা বংশ সম্বন্ধীয় মাহরাম নারীদের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে, **কোনো মহিলা যখনই মূল হবেন বা শাখা হবেন অথবা আপনার পিতা-মাতা বা দাদা-দাদী ও নানা-নানীর যে কারোর শাখা হবেন, তখনই তিনি আপনার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবেন।** অর্থাৎ কোনো মহিলা যখনই মূল হবেন তথা মা বা দাদী-নানী হবেন অথবা শাখা হবেন তথা মেয়ে বা ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে হবেন বা পিতা-মাতা যে কোনো একজনের শাখা হবেন তথা বোন হবেন অথবা দাদা-নানা যে কোনো একজনের শাখা হবেন তথা ফুফু বা খালা হবেন, তখনই তিনি আপনার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবেন।[১২]

জন্মগ্রহণ বা বংশসূত্রে মাহরাম নারীগণ হচ্ছেন মোট ৭ শ্রেণির, নিচে যাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হলো:

(১) মা, দাদী-নানী ও তদূর্ধ্ব নারীগণ।
(২) মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ের মেয়ে— এভাবে যত নিচে নামুক।
(৩) সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন।
(৪) ভাইয়ের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ের মেয়ে, ভাইয়ের ছেলের মেয়ে।
(৫) বোনের মেয়ে, বোনের ছেলের মেয়ে, বোনের মেয়ের মেয়ে।
(৬) ফুফু।
(৭) খালা।

এই ৭ শ্রেণির বিবরণ মহান আল্লাহ সূরা আন-নিসার ২৪ নম্বর আয়াতের শুরুতে টানা উল্লেখ করেছেন এভাবে, ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজিদেরকে, ভাগনিদেরকে'।

বংশসূত্রে এর বাইরে যারা আছেন, তারা মাহরাম নন। যেমন- ফুফুর মেয়ে, চাচার মেয়ে, মামার মেয়ে, খালার মেয়ে। তাই তো মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন, ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ 'এদের বাইরে যারা রয়েছে, তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে' *(আন-নিসা, ৪/২৪)*।[১৩]

সুতরাং যে কোনো খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে মহান আল্লাহর ফরয এ বিধান লঙ্ঘন করা হারাম। কারণ তিনি মাহরাম নারীগণের তালিকা পেশ করার পরে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ 'আল্লাহ এসব ব্যবস্থা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন' *(আন-নিসা, ৪/২৪)*।

(চলবে)

৭. তাফসীর কুরতুবী, সূরা আন-নিসার ২৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৫/১০৮।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. দ্রষ্টব্য: বাকর মুহাম্মাদ ইবরাহীম, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৭; মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৩৮।
১২. মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৩৮-৩৯।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

গোপন পাপ : ভয়াবহতা ও পরিত্রাণের উপায়

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি হলো সে নিজের অপরাধ আড়াল করতে চায়। হাজারো মানুষের কোলাহলে নিজেকে সবাই ভালো বলুক; আভিজাত্যে, মর্যাদায় ও সুনামে ঝরঝরে দেখা যাক- এটাই সে প্রত্যাশা করে থাকে। কারো কারো পক্ষে অন্যায় বা গোপন পাপ ঢেকে রাখা কখনো কখনো নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য সম্ভব হলেও সর্বদা তা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। মানুষ যখন জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপনে গুনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে ধীরে ধীরে মহান আল্লাহর ভয় বিদায় নিতে থাকে। অন্তর যখন তাক্বওয়াশূন্য হয়ে যায়, তখন অন্তর পাথরের মতো শক্ত হতে যায়। তখন তার কাছে ইসলামী ধ্যানধারণা মনোরম ও আকর্ষণীয় লাগে না। ধর্মীয় বিধানাবলি বিরক্তিকর মনে হতে থাকে। অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মুনাজাতে চোখে পানি আসে না। এক পর্যায়ে তার কোনো আমলে আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কুরআন তেলাওয়াত আর আগের মতো মধুর মনে হয় না। ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার গলিপথ তার কাছে আপন মনে হয়। মাঝে মাঝে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়; কিন্তু বাঁচতে পারে না, তার পক্ষে ইউটার্ন নেওয়া আর সম্ভব হয়ে উঠে না। অবস্থা তো কখনো এমন ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন।

আর কেউ কেউ আছে পাপ করতে করতে এক সময় পাপকে আর পাপই মনে করে না! তার কাছে পাপ করা তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার হয়ে যায়। তখন আল্লাহর ক্রোধ আর পরকালের ভয়াবহ আযাবকে সে পরোয়া করে না। ফলে এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ তার জন্য পাপের কাজকে তার কাছে প্রিয় করে তুলেন! আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ‘যাকে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করেছে (সে কি তার সমান, যে সৎপথে পরিচালিত?) নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন। আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কাজেই তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনি আপনার জীবনকে ধ্বংস হতে দিয়েন না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত’ *(ফাত্বির, ৩৫/৮)*।

পাপ কাজ শোভনীয় মনে হতে হতে একসময় সে পাপ কাজকে তখন ভালোবাসতে শুরু করে, ফলে তার তওবা করার নছীব হয় না। আর এই অবস্থায় সে আল্লাহর ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত, নিয়মিত ছালাত আদায় করে, দ্বীনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা বা তথাকথিত বুজুর্গ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না; কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত (সাধারণত বাংলাদেশের কিছু মাযারের সেবক ও পীরদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে)। আবার অনেকে প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কবীরা গুনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেক্বী ও শঠতা, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ ‘তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ পরিত্যাগ করো। নিশ্চয় যারা গুনাহ করবে, অতিসত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে’ *(আল-আনআম, ৬/১২০)*।

এ ধরনের গোপন পাপ কথার দ্বারা হতে পারে, চিন্তা বা নিয়্যতের দ্বারাও হতে পারে আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। যেমন— গোপনে গায়রুল্লাহর নাম নিয়ে পশু যবেহ করা গোপন পাপ। রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করার নিয়্যত বা চিন্তা করা গোপন পাপ। আর অপ্রকাশ্য ব্যভিচার (পরকীয়া) বা গোপন যেনা (প্রেম) হলো কর্মগত গোপন পাপ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘আপনি বলে দিন! বস্তুত আমার পালনকর্তা হারাম করেছেন অশ্লীল বিষয়সমূহ, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আর হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩৩)*।

* সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস, সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

প্রকাশ্য গুনাহের চেয়ে গোপনে করা গুনাহ বেশি ভয়াবহ। কেননা যখন কেউ গোপনে গুনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নেয়। ক্রমাগত সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবস্থা কখনো এত ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বর্তমান সময়ে গোপন গুনাহের সরঞ্জাম অনেক বেশি আর উপকরণগুলোও সহজলভ্য। আগের দিনে সিনেমা দেখতে অনেক দূর যেতে হতো, অনেক টাকা খরচ হতো আর এখন মোবাইল ফোনে সেকেন্ডে সেকেন্ডে সিনেমা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। ডেটা অন করে মোবাইল খুললেই হাজারো নোটিফিকেশন আর পাপের হাতছানি। তাই সমাজের মানুষ দিন দিন গোপন গুনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বীনদার শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে আলেম-উলামাও বাদ পড়ছেন না এর ভয়াল থাবা থেকে। তীব্র ঈমানী শক্তি ছাড়া এ জাহেলিয়াত থেকে বাঁচা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

বর্তমানে গোপন গুনাহের উপকরণগুলো অনেক বেশি ও অত্যন্ত সহজলভ্য। এর ভয়াবহ ফলাফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রচুর মানুষ এখন সংশয়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। দু-চারজন এটা নিয়ে চিন্তিত ও চিকিৎসা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীনই থেকে যাচ্ছে। শেষ যামানায় যে মানুষ ব্যাপকহারে ঈমানহারা হতে থাকবে, তার বাস্তবায়ন বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে কতজন যে আখেরাতে মুক্তি পাবে, তা একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন!

ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنَ الذُّنُوْبِ خُصُوْصًا ذُنُوْبِ الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الْمُبَارَزَةَ للهِ تَعَالَى تُسْقِطُ الْعَبْدَ مِنْ عَيْنِهِ وَأَصْلِحْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي السِّرِّ وَقَدْ أَصْلَحَ لَكَ أَحْوَالَ الْعَلَانِيَةِ ‘গুনাহ থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকবে; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা আল্লাহর সাথে (গোনাহের মাধ্যমে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে পাপ বান্দাকে তাঁর দৃষ্টি থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো, তাহলে তিনি তোমার বাহ্যিক বিষয় সংশোধন করে দেবেন’।[১] ইমাম ইবনুল আরাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَخْسَرُ الْخَاسِرِيْنَ مَنْ أَبْدَى لِلنَّاسِ صَالِحَ أَعْمَالِهِ، وَبَارَزَ بِالْقَبِيْحِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ‘সর্বাধিক ক্ষতিগস্ত সে, যে মানুষের সামনে ভালো আমল জাহির করে, আর বদ আমলের মাধ্যমে সেই মহান সত্তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, যিনি তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী’।[২] হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ إِمَّا مِنْ جِهَةِ عَمَلٍ سَيِّئٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَتِلْكَ الْخَصْلَةُ الْخَفِيَّةُ تُوجِبُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ ‘বান্দার মন্দ মৃত্যু হয়ে থাকে গোপন গুনাহের কারণে, যা মানুষ জানে না; চাই তা খারাপ কোনো আমল হোক বা অন্য কিছু। তার এ গোপন চরিত্রই মৃত্যুর সময় মন্দ পরিণাম অবধারিত করে’।[৩]

গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় :

(১) পাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা ও কান্নাকাটি করা এবং আল্লাহর কাছে দু‘আ করা; যেন তিনি তাকে তাঁর সকল নাফরমানী ও গুনাহ থেকে হেফাযত করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ‘আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; (তখন আপনি বলে দিন) নিশ্চয়ই আমি (তাদের) সন্নিকটেই রয়েছি; আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমাকে মান্য করে, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যাতে তারা সৎপথে পরিচালিত হতে পারে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*।

(২) নিজের অন্তর্গত সত্তার সাথে যুদ্ধ করা, তার কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ‘শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে, আর অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে কলুষিত করেছে’ *(আশ-শামস, ৯১/৭-১০)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘যারা আমাদের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য প্রচেষ্টা করবে, অবশ্যই আমরা তাদেরকে আমাদের পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬৯)*।

(৩) ক্বিয়ামতের দিন গোপন গুনাহকারীদের আমলসমূহ ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়ার কথা মনের ভাবনায় চিরজাগরুক করে রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا

১. ছয়দুল খাত্বির (প্রকাশনী : দারুল ক্বালাম, দামেশক), পৃ. ২০৭।

২. তারীখু দিমাশক্ব (প্রকাশনী : দারুল ফিকর, বৈরূত), ৫/৩৫৬।

৩. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম (প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত), ১/১৭২-১৭৩।

مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا ‘আমি অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু মানুষ সম্পর্কে জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন’। ছাওবান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, ‘তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা ইবাদত করবে, যেভাবে তোমরা করে থাকো। কিন্তু তারা এমন লোক হবে যে, যখন তারা একাকী থাকবে, তখন তারা আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে’।[৪]

(৪) আল্লাহ তাআলার পর্যবেক্ষণের কথা চিন্তা করা ও মনে করা যে, তিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে ভয় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাকো এবং তোমরা ভয় করো রক্ত সম্পর্ক (ছিন্ন করাকে)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক’ *(আন-নিসা, ৪/১)*।

(৫) পাপ, অন্যায় বা গুনাহ করার সময় এ চিন্তা করা যে, আমার শ্রদ্ধেয় বড় কেউ দেখলে কি আমি এমন গুনাহ করতে পারতাম? এভাবে নিজের লজ্জাবোধ জাগ্রত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, اسْتَحِي اللهَ اسْتِحْيَاءَ رَجُلٍ ذِي هَيْبَةٍ مِنْ أَهْلِكَ ‘তুমি আল্লাহকে লজ্জা করো, যেভাবে তুমি তোমার পরিবারের কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে লজ্জা পাও’।[৫]

(৬) নিজে মনে মনে এ চিন্তা করা যে, গুনাহরত অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে কীভাবে আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ‘প্রত্যেক ব্যক্তিকে (ক্বিয়ামতের দিন) ওই অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে’।[৬]

(৭) আল্লাহর নেয়ামত ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করা এবং জাহান্নামের আযাব ও ভয়াবহ শাস্তির কথা কল্পনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ‘নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রপথ অবলম্বন করে তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি উত্তম, নাকি সে, যে ক্বিয়ামত দিবসে নিরাপদভাবে উপস্থিত হবে (সে উত্তম)? তোমাদের যা ইচ্ছা আমল করো। নিশ্চয় তোমরা যা আমল কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা’ *(ফুছছিলাত, ৪১/৪০)*।

(৮) ব্যক্তিগত জীবনের অবসরে যিকির ও ফিকিরে থাকার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ‘নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনের মাঝে বহু নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য’ *(আলে ইমরান, ৩/১৯০)*।

তিনি আরও বলেন, ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ‘যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং তারা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (তারা বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র মহান। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৯১)*।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা ঈমানের জন্য নিয়মিত দু‘আ করতে থাকি, গোপন গুনাহ থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকি, মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে দূরে থাকি। দ্বীনদার আলেমদের ছোহবতে বেশি বেশি থাকি এবং কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার ও ইসলামী বই অধিকহারে অধ্যয়ন করতে শুরু করি। পাপ হয়ে গেলে দ্রুতই ফিরে আসতে হবে এবং তওবা করতে হবে। পাপের উপর অটল থাকা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। শিরকমুক্ত ঈমান ও বিদআতমুক্ত আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। ঈমানের হালতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৪৫, হাদীছ ছহীহ।
৫. মুসনাদে বাযযার, ১/৪০৫, হা/২৬৪২।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৭৮।

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৫)

নবীদের হাদীছ অমান্য করায় গযব :

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কিতাবের সাথে রাসূল পাঠিয়েছেন। কেননা তিনি জানেন, তিনি যদি শুধু কিতাব পাঠান, তাহলে কিতাব বুঝা নিয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ তৈরি হবে। কিতাব যেন মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে এই জন্য প্রত্যেক কিতাবের সাথে রাসূল পাঠানো হয়েছে। কোনো কিতাবই আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা দিয়ে লিখিত আকারে আসমান থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পাঠিয়ে দেননি; বরং কিতাবের সাথে রাসূলও প্রেরণ করেছেন।

নবী-রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের সকল আয়াত যদি আমরা সামনে রাখি, তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যে, মহান আল্লাহর মুখ্য উদ্দেশ্য নবী ও নবুঅত। নবীদের মূল দাবি হয়ে থাকে তাওহীদ যা কোনো প্রকার কিতাব ছাড়াই স্বভাবজাত চিন্তাভাবনা দ্বারাই মানুষ অনুভব করতে পারবে। সুতরাং তাওহীদের দিকে ডাকার জন্য সবসময় কিতাবের প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক অহী তথা হাদীছই যথেষ্ট। এই জন্য বহু নবীকে আল্লাহ তাআলা কিতাব প্রদান করেননি। তবে নবুঅতের প্রমাণের জন্য তিনি বিভিন্ন সময় নবীদেরকে বিভিন্ন নির্দশন প্রদান করেছেন। কিছু কিছু নবীর ক্ষেত্রে তাদের প্রতি প্রদত্ত কিতাবই নিদর্শন আবার কিছু ক্ষেত্রে কিতাব ছাড়া ভিন্ন নিদর্শন আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। সুতরাং নবীদের সত্যবাদিতা এবং তাওহীদের দাওয়াতের সহজবোধ্যতাই মহান আল্লাহর নবী প্রেরণের মৌলিক ভিত্তি। প্রত্যেক জাতির ধ্বংসের ক্ষেত্রে মুখ্য কারণ হচ্ছে নবীদেরকে মিথ্যারোপ করা। তাদের কথা ও আদেশকে অমান্য করা। তথা তাদের হাদীছকে অমান্য করা। এই জন্য কিতাববিহীন নবী প্রেরণ করা হলেও নবীবিহীন কোনো কিতাব মহান আল্লাহ প্রেরণ করেননি।

নিম্নে আমরা পবিত্র কুরআন থেকে বিভিন্ন নবীর উদাহরণ পেশ করব। যা দ্বারা প্রমাণিত হবে নবীদের কথা তথা তাদের হাদীছকে অমান্য করার কারণেই মহান আল্লাহর আযাব এসেছে।

নূহ আলাইহিস সালাম -এর ক্বওম : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ - أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ - فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ ‘আর অবশ্যই আমরা নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর ক্বওমের কাছে (এই বার্তা দিয়ে) যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের ভয় করছি। অতঃপর তাঁর ক্বওমের যারা কুফরী করেছিল, তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলল, ‘আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষই দেখছি, আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নিচু শ্রেণির লোকেরাই চিন্তাভাবনা ছাড়াই তোমার অনুসরণ করেছে। আর আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করছি’ *(হূদ, ১১/২৫-২৭)*।

দলীলের যৌক্তিকতা :

(১) উক্ত আয়াতে নূহ আলাইহিস সালাম -এর প্রতি যারা ঈমান আনয়ন করেছিল তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা নূহ আলাইহিস সালাম -এর অনুসরণ করেছে।

(২) যারা নূহ আলাইহিস সালাম -এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তারা নূহ আলাইহিস সালাম -কে মিথ্যারোপ করেছে।

(৩) নূহ আলাইহিস সালাম -এর বলা প্রতিটি কথাকে আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম -এর কথা হিসেবেই পেশ করেছেন। নূহ আলাইহিস সালাম -এর উপর অবতীর্ণ কোনো কিতাবের আয়াত হিসেবে নয়। তথা এই কথাগুলো নূহ আলাইহিস সালাম -এর হাদীছ। যা অমান্য করার কারণে তারা গযবের শিকার হয়েছে।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ - وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ - وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ‘যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে ক্বওমে নূহ, আদ, ছামূদ, ক্বওমে ইবরাহীম ও ক্বওমে লূত এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরাও (তাদের নবীদের) মিথ্যাবাদী বলেছে। আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান

ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

ও শাস্তি' *(আল-হজ্জ, ২২/৪২-৪৪)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ 'আর যখন নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করল তখন আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে মানুষদের জন্য নিদর্শন করে দিলাম। আর আমরা অত্যাচারীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৩৭)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ 'নূহের ক্বওম রাসূলদের মিথ্যারোপ করেছিল' *(আশ-শুআরা, ২৬/১০৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ 'আর নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তারা আমাকে অমান্য করেছে' *(নূহ, ৭১/২১)*।

দলীলের যৌক্তিকতা : উপরের সকল আয়াতে নবী হিসেবে নূহ আলাইহিস সালাম-কে মিথ্যারোপ করার কথা বলা হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম-কে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। যার কারণে তারা মহান আল্লাহর গযবের স্বীকার হয়েছে।

হূদ আলাইহিস সালাম-এর ক্বওম : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ - أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ - وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ - وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ - أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ - وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ - قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ - إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ - وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ - فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ - وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ 'আদ সম্প্রদায় নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল জগৎসমূহের পালনকর্তার কাছে। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে নিদর্শন নির্মাণ করছ স্রেফ চিত্তবিনোদন ও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য জানান দেওয়ার জন্য? আর তোমরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা তাতে চিরকাল থাকবে? যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও করো, তখন তোমরা প্রতাপশালী হয়ে পাকড়াও করো। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুগত্য করো। ভয় করো তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জানো। তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান এবং বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। তারা বলল, 'এটা আমাদের জন্য সমান, চাই তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হও। এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাসচরিত বৈ কিছুই নয়। আমরা মোটেও শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। সুতরাং তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে বলল এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না এবং নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু' *(আশ-শুআরা, ২৬/১২৩-১৪০)*।

দলীলের যৌক্তিকতা :

(১) উক্ত আয়াতগুলোতে দুই বার হূদ আলাইহিস সালাম তার ক্বওমকে তার আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেছেন।

(২) তার আদেশগুলোকে তার উপদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

(৩) নবীকে মিথ্যারোপ করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

(৪) হূদ আলাইহিস সালাম-এর সকল কথা আল্লাহ তাআলা হূদ আলাইহিস সালাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করেই কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের নবীর কথা তার ছাহাবীদের সাথে হাদীছে পড়ে থাকি। তথা পুরো বিষয়টিই নবীর নবুঅতের দাবি তাওহীদের দাওয়াত এবং নবীর কথাকে বিশ্বাস করার সাথে। তথা হূদ আলাইহিস সালাম-এর হাদীছ অস্বীকার করার কারণেই তার ক্বওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ - يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ - وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ - قَالُوا يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ 'আর আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বূদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝো না?

আর হে আমার ক্বওম! তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা অপরাধীদের মতো বিমুখ হয়ো না। তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসোনি, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-

দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই' *(হূদ, ১১/৫০-৫৩)*।

দলীলের যৌক্তিকতা :

(১) প্রাথমিক অবস্থায় হূদ আলাইহিস সালাম কোনো প্রকার নিদর্শন ছাড়াই নিজের ক্বওমকে দাওয়াত দিতে থাকেন।

(২) আল্লাহ তাআলা হূদ আলাইহিস সালাম-কে নিদর্শন হিসেবে কোনো কিতাব প্রেরণ করেননি। যেমন মূসা আলাইহিস সালাম যখন তার ক্বওমের নিকট দাওয়াতি কাজ শুরু করেন, তখন তার কাছে কোনো কিতাব ছিল না। নিদর্শন হিসেবে লাঠি ছিল। আর কিতাব পেয়েছেন ফেরাউন ডুবে যাওয়ার পর। যা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ। সুতরাং এই কথা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট যে, নবীদের প্রতি ঈমান মানে মূলত তাদের কথা তথা হাদীছের প্রতি ঈমান। তাদের কিতাব মুখ্য নয়। মহান আল্লাহ কখনো কিতাব প্রদান করে থাকেন আবার কখনো কিতাব ছাড়াই স্বাভাবিক অহী প্রেরণ করেন তথা হাদীছ প্রেরণ করেন।

ছালেহ আলাইহিস সালাম-এর ক্বওম : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ - أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ - فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ - وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ - قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ - مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ - قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ - وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ - فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ - فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ - وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ 'ছামূদ সম্প্রদায় নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। যখন তাদের ভাই ছালেহ তাদেরকে বলছিলেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো আর আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তোমরা এখানে যেভাবে আছো, তোমাদেরকে কি সেভাবে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে? উদ্যানসমূহ এবং ঝর্ণাসমূহের মধ্যে? শস্যক্ষেত্র এবং কোমল মুকুলবিশিষ্ট খেজুরবাগানের মধ্যে? আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুগত্য করো। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং সংশোধন করে না; তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ বৈ কিছুই নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের কাছে কোনো একটি নিদর্শন উপস্থিত কর। ছালেহ বললেন, 'এই উষ্ট্রী, এর রয়েছে পানি পান করার পালা এবং তোমাদের জন্যও রয়েছে পানি পানের নির্দিষ্ট দিন। তোমরা একে ক্ষতি সাধনের জন্য স্পর্শ করো না; পাছে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। অতঃপর তারা তাকে হত্যা করল, তারপর তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। ফলে আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু' *(আশ-শুআরা, ২৬/১৪১-১৫৯)*।

দলীলের যৌক্তিকতা :

(১) প্রথমেই আমরা দেখেছি ছালেহ আলাইহিস সালাম তার ক্বওমের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত হিসেবে দাবি করছেন এবং এই বিশ্বস্ততার কারণেই তাকে সত্যায়ন করার আহ্বান জানাচ্ছেন, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে নবীদের ক্ষেত্রে তাঁদের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততাই নবুঅতের অন্যতম ভিত্তি।

(২) ছালেহ আলাইহিস সালাম-এর নিকট যখন তার ক্বওম নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল, তখন তিনি উষ্ট্রীকে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেন। তথা সকল নবীর ক্ষেত্রে কিতাবকে নিদর্শন করা হয়নি। বহু নবীর ক্ষেত্রে কিতাবের বাইরেও নিদর্শন প্রদান করা হয়েছিল, যা প্রমাণ করে, নবীদের হাদীছের অনুসরণ নবীদের প্রতি ঈমান আনয়নের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

(৩) তারা ছালেহ আলাইহিস সালাম-এর উটনী সংক্রান্ত কথাকে বিশ্বাস করেনি বরং মিথ্যারোপ করেছে। যার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তথা ছালেহ আলাইহিস সালাম-এর হাদীছ অমান্য করার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

(৪) ছালেহ আলাইহিস সালাম নবী হওয়ার পরও কেনো তিনি মানুষের মতো এটি ছিল তাদের একটি অভিযোগ। যুগে যুগে প্রায় নবীর ক্ষেত্রে এই অভিযোগটি উত্থাপন করা হয়েছে যে, কেনো তারা সাধারণ মানুষের মতো মানুষ। কাফেরদের দ্বারা উত্থাপিত উক্ত অভিযোগটি থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ হওয়া নিয়ে তখনই প্রশ্ন উঠতে পারে যখন নবী হিসেবে নবীকে নিঃশর্ত অনুসরণ করতে হয়। তখনই মূলত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আমাদের মতো মানুষের কেনো আমরা নিঃশর্ত অনুসরণ করব। সুতরাং মানুষদের মধ্যে থেকে নবী পাঠানো এবং তাদের মানুষ হওয়া নিয়ে কাফেরদের প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রমাণ করে যে, নবী হিসেবে নবীগণ নিঃশর্তভাবে অনুসরণীয়। তাদের সাথে কিতাব থাকুক অথবা না থাকুক।

(চলবে)

ইসলামে দলীলের প্রয়োজনীয়তা : ছূফী-সুন্নীর প্রেক্ষিতসহ

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

ইসলামই একমাত্র ইলাহী ধর্ম, যেখানে যত কিছুই পালন করা হোক না কেন তার সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ থাকতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। সুতরাং ইসলামে নতুন করে কোনো কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না। একই সাথে কেউ ইসলামে নতুন কিছুর অবতারণা করলে তাকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি নিয়ে আসতে হবে। কেননা আল্লাহ নিজেই যেকোনো কাজের জন্য দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপনের আহ্বান করেছেন। যেমন কাফেররা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা সন্তান দাবি করলে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের কাছে এর প্রমাণ চেয়েছেন এভাবে, ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ ‘না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোনো দলীল রয়েছে?’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১৫৬)*। সুতরাং ইসলামে ঈমান, আমল, আক্বীদার ক্ষেত্রে অবশ্যই দলীল এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে হবে।

আজ ইসলাম বহুধারায় বিভক্ত। মুসলিমগণ হাজারো শাখা-উপশাখায় বিভক্ত। এতসব শাখা-উপশাখার মধ্যে কারা সঠিক ঈমান ও আক্বীদা পোষণ করে, তা যাচাই করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা সবাই নিজেদের সঠিক এবং সত্য বলে দাবী করে। কিন্তু মুখের কথায় কখনোই কাউকে মান্য করা যাবে না। যেকোনো দলের বা গোষ্ঠীর ঈমান, আমলগুলো অবশ্যই দালীলিকভাবে প্রমাণিত হতে হবে। যারা সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ দিতে পারবে তাদের ঈমান, আক্বীদা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

অথচ আমাদের উপমহাদেশে বৃহৎ একটি ইসলামী গোষ্ঠী যারা নিজেদের সুন্নী বলে দাবী করে, তারা তাদের ঈমান ও আক্বীদায় এমন কিছু আমল করে যা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর বাইরে নিজেদের মনগড়া কথায় কখনোই ইসলাম পরিচালিত হয় না। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কাফের-মুশরিকদের থেকে দলীল ও প্রমাণাদি চাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বিশেষ করে মুশরিকরা যখন আল্লাহর সাথে অন্যান্য দেবদেবী, অলী-আউলিয়ার শরীক করে, তখন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ ‘আমি কি তাদের কাছে এমন কোনো দলীল নাযিল করেছি, যা তারা যে শিরক করে, তার (পক্ষে) কথা বলে?’ *(আর-রূম, ৩০/৩৫)*।

ছূফী-সুন্নীরা তাদের বিভিন্ন পীর, অলী-আউলিয়ার আল্লাহর সমকক্ষ করে গাউছুল আযম, গরীবে নেওয়াজ ইত্যাদি নামে ডাকে এবং তাদের কাছে সাহায্য চায়। যার কোনো প্রমাণ কুরআন-হাদীছের কোথাও নেই। সুতরাং এটা শিরক। কিন্তু দলীল ছাড়াই এ জাতীয় অসংখ্য শিরকী আক্বীদা তাদের মধ্যে রয়েছে, যা আল্লাহ কখনোই পছন্দ করেন না। কেননা আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ‘যারা নিজেদের কাছে আগত কোনো দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তা আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক’ *(আল-মুমিন, ৪০/৩৫)*।

অর্থাৎ এইসব ছূফী-সুন্নীদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট আয়াত দিয়ে প্রমাণ দেওয়ার পরও তারা তাদের অবস্থানে অনড় থাকে এবং তারা তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করে কোনো প্রমাণ ছাড়াই। একইভাবে এইসব ছূফী-সুন্নীরা কুরআন-হাদীছের বাইরে নিজেদের পীর, অলী-আউলিয়াকে নানান উপাধিতে (গাউছুল আযম, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি) ভূষিত করে, যার কোনো প্রমাণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ থেকে আসেনি। যেমনভাবে প্রমাণিত ছিল না তৎকালীন আরবের মুশরিকদের বিভিন্ন দেব-দেবী তথা লাত, মানাত, উযযা প্রভৃতিকে আল্লাহর সাথে শরীক করার ক্ষেত্রে। এদেরকে মুশরিকরা পূজা করত, সাহায্য চাইত এবং আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে মানত। অথচ তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ এগুলো কেবল কতিপয় নামমাত্র, যে নামগুলো ‘তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি’ *(আন-নাজম, ৫৩/২৩)*।

অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলীল নেই, কিন্তু তারা তাদেরকে মানতে লাগল যেমন তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের শিখিয়ে গেছে। যেমনটা হচ্ছে বর্তমান ছূফী-সুন্নীদের বেলায়। তারা তাদের বড় বড় বুজুর্গদের কাছ থেকে আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন কবরবাসীকে নানান উপাধিতে ভূষিত করে পূজা-নযর-নেওয়াজ পেশ করে যাচ্ছে, যা সুস্পষ্ট গোমরাহী।

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

অথচ তারা সাধারণ মুসলিম যারা কুরআন হাদীছ জানে না, তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে বিভ্রান্ত করে এবং দাবী করে তাদের পীর, অলী-আউলিয়া ক্বিয়ামতের মাঠে সকল মুরীদের সুপারিশের মাধ্যমে ক্ষমা করিয়ে নিবে। অথচ সুপারিশ করার বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর হাতে। আল্লাহ বলেন, ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ 'কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?' *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৫)*। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে হলেও তাঁর অনুমতি লাগবে। তিনি যাকে যার জন্য অনুমতি দিবেন কেবল তিনিই তার জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। সুতরাং নেককার ব্যক্তি অবশ্যই সুপারিশ করতে পারবে, তবে আল্লাহ তাকে যার জন্য অনুমতি দিবেন, তিনি কেবল তার ক্ষেত্রেই সুপারিশ করতে পারবেন। তাহলে যিনি দুনিয়ায় ঈমান আমলের ধারেকাছেও ছিল না, তাকে কীভাবে একজন নেককার ব্যক্তি সুপারিশ করতে পারেন কিংবা আল্লাহ সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন?

তারপরও ছূফী-সুন্নীরা দাবী করে, তাদের পীরেরা তাদের মুরীদদের অবশ্যই শত হাজার গুনাহ থাকলেও পার করিয়ে নিবেন। যেমনটা বলে ইয়াহূদী-নাছারা। কুরআনে এসেছে, ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ 'ওরা বলে, ইয়াহূদী অথবা নাছারা ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১১১)*।

এইসব ছূফী-সুন্নীরা বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পরিবর্তে সরাসরি তাদের পীর, আউলিয়াকে বিভিন্ন নামে ডাকে। একেকজন পীর, অলী একেক কাজের জন্য সমাদৃত। যেমন মক্কার মুশরেকরা তাদের বিভিন্ন দেব-দেবীকে নানান নামে ডেকে ইবাদত-বন্দেগী করত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ 'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি' *(ইউসুফ, ১২/৪০)*।

সুতরাং মক্কার মুশরিকরা তাদের বাপ-দাদার অনুসরণে তৎকালীন অসংখ্য দেব-দেবীর যেমন বিভিন্ন নামে ডাকত, ঠিক তেমনি ছূফী-সুন্নীরাও তাদের বড় বড় বুজুর্গদের অনুসরণে বিভিন্ন পীর, অলী-আউলিয়াকে নানান নামে ডেকে তাদের ইবাদত-বন্দেগী করে। অথচ আল্লাহ মুশরিকদের যেমন কোনো দলীল অবতীর্ণ করেননি, ঠিক তেমননি ছূফী-সুন্নীদেরও কুরআন-হাদীছের কোনো দলীল নেই। তারা শুধু আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতেই ইসলাম পালন করে, যেমনটা করত মক্কার মুশরিকরা। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ 'আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে, যা আমাদের কাছে পেশ করতে পারো। তোমরা শুধু আন্দাজের অনুসরণ করো এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বলো' *(আল-আনআম, ৬/১৪৮)*।

সুতরাং অনুমান দিয়ে কখনোই ইসলাম পালন করা যাবে না। আল্লাহ সৃষ্টির শুরু থেকেই বিভিন্ন দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কখনোই কোনো প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু আল্লাহ গ্রহণ করেন না। এই সম্পর্কে আল্লাহ অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন।

অতএব, ইসলামের নামে যেকোনো আমল করার আগে অবশ্যই তার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীছের দলীল-প্রমাণ দিতে হবে। শুধু তাই নয় যেকোনো মুমিন, মুসলিম ইসলামের নামে যেকোনো আমল করার আগে অবশ্যই তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! কোনো ফাসেক্ব যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বসো! ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়' *(আল-হুজুরাত ৪৯/৬)*।

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি দুনিয়াবী কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা অবশ্যই যাচাই-বাছাই করে এর সত্যতা নিরূপণ করতে হবে, যাতে কোনো প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে না হয়। অতএব, যেখানে দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে আল্লাহ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে আখেরাতের বিষয় নিয়ে আমাদের কতটুকু সতর্ক হওয়া উচিত, তা বলাই বাহুল্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, ইসলামে ঈমান, আমল, আক্বীদার ক্ষেত্রে অবশ্যই দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তা পালন করতে হবে। অথচ ছূফী-সুন্নীদের ঈমান ও আক্বীদাসমূহের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দালীলিক কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং তা কোনোমতেই পালন করা যাবে না। আল্লাহ আমাদের উপযুক্ত দলীল-প্রমাণাদিসহ সকল আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

(পর্ব-৬)

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুনাফেক্বীর অন্ধকার

১. নিফাক্বের তাৎপর্য :

(ক) নিফাক্বের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

নিফাক্বের শাব্দিক অর্থ : نفق (নাফাক্ব) অর্থ যমীনের সুড়ঙ্গ, অন্য জায়গায় নির্গত পথ। তাহযীবে রয়েছে অন্য যায়গায় যার পৌঁছার জায়গা রয়েছে। নাফাক্বা (نفقة) ও নাফিক্বা (نافقاء) অর্থ গোসাপ ও ইঁদুরের গর্ত। নাফাক্বা ও নাফিক্বা এমন জায়গা, ইঁদুর তার গর্ত থেকে যে জায়গাটি পাতলা করে রাখে। গর্তের অপর পথ দিয়ে যখন আসা হয়, তখন ইঁদুর তার বের হওয়ার এই জায়গাটিতে মাথা দিয়ে আঘাত দিয়ে বের হয়ে যায়। (نفق اليربوع) যবর দিয়ে (نفق ও نفق، انتفق) অর্থ: ইঁদুর তার গর্ত থেকে বের হলো। আর (نفق اليربوع نافق ও تنفيقا) অর্থ: ইঁদুর তার সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করল। এর থেকেই দ্বীনের মধ্যে মুনাফেক্ব শব্দের উৎপত্তি। আর (نفاق) নিফাক্ব শব্দটিতে যের দিয়ে অর্থ হয় মুনাফেক্বের কর্ম। নিফাক্ব হলো এক দিক থেকে ইসলামে প্রবেশ করা এবং অন্য দিক থেকে ইসলাম হতে বের হওয়া'।[১]

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ 'তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-আদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুকরণ করবে, এক বিঘত এক বিঘতের সঙ্গে ও হাত হাতের সঙ্গে, এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তারা কি ইয়াহূদী ও নাছারা? তিনি বলেন, তবে আর কারা?'[২]

নিফাক্বের পাবিভাষিক অর্থ : ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار. وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه أن شاء الله تعالى، وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه 'নিফাক্ব হলো কল্যাণ প্রকাশ করা ও অকল্যাণ গোপন করা। তা কয়েক প্রকার: (১) বিশ্বাসগত নিফাক্ব। তা ব্যক্তিকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করে। (২) আমলগত নিফাক্ব। এটা সবচেয়ে বড় গুনাহ। ইবনু জুরাইজ বলেন, মুনাফেক্ব হলো, যার কথা তার কাজের বিপরীত হয়, যার গোপনীয়তা তার প্রকাশ্যতার বিপরীত হয়। যার প্রবেশপথ তার বের হওয়ার পথের ভিন্ন হয় এবং যার উপস্থিতি তার অনুপস্থিতির ভিন্ন হয়'।[৩]

নিফাক্ব দুই প্রকার : (১) বড় নিফাক্ব, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় ও (২) ছোট নিফাক্ব, যা ইসলাম থেকে বের করে না'।[৪]

(খ) যিন্দীক্ব শব্দের অর্থ :

যিন্দীক্ব (الزنديق) যের দিয়ে, দৈত্ববাদ অথবা দুই ইলাহ: আলো ও অন্ধকার মতাদর্শের অনুসারী অথবা যে আখেরাত ও তাওহীদে রুবূবিয়্যাতকে বিশ্বাস করে না অথবা যে কুফরী গোপন ও ঈমান যাহির বা প্রকাশ করে'।[৫]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ফক্বীহদের পরিভাষায় যিন্দীক্ব হলো, ঐ প্রকারের মুনাফেক্ব, যে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল। আর তা হলো, যে ইসলাম প্রকাশ করে এবং অন্যটি গোপন করে। চাই তা কোনো দ্বীন বা ধর্মকে গোপন করুক যেমন— ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান বা অন্যান্য ধর্ম অথবা নাস্তিক, সৃষ্টিকর্তা, পরকাল ও সৎ আমলের অবিশ্বাসী হোক।

কিছু মানুষ বলে, যিন্দীক্ব হলো, অবিশ্বাসী নাস্তিক। অধিকাংশ দার্শনিক, কালামশাস্ত্রবিদ এবং জনসাধারণ ও মানুষের মত বর্ণনাকারীদের পরিভাষায় এটাই যিন্দীক্বের সংজ্ঞা। কিন্তু যে প্রকার যিন্দীক্বের হুকুম বা বিধানের ব্যাপারে ফক্বীহগণ আলোচনা করেছেন, তা হলো প্রথমটি। কারণ তাদের উদ্দেশ্য হলো, যে কাফের এবং যে কাফের নয়, মুরতাদ এবং মুরতাদ নয়, যে এটা প্রকাশ করে এবং যে এটা গোপন করে তার মাঝে পার্থক্য করা।

আর এই হুকুম বা বিধানের মধ্যে সকল প্রকার কাফের ও মুরতাদ অন্তর্ভুক্ত। যদিও কুফর ও বিদআতের ক্ষেত্রে তাদের

নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. শায়খ আব্দুর রহমান আদ-দাওসরী, আন-নিফাক্ব ওয়া আছারুহ ওয়া মাফাহিমাহু, পৃ. ১০৫-১০৬।

২. ছহীহ মুসলিম, 'ইলম' অধ্যায়, 'ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের আদর্শ অনুকরণ' অনুচ্ছেদ, হা/২৬৬৯; মিশকাত, হা/৫৩৬১।

৩. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ১/৪৮। এই আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ 'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়' *(আল-বাক্বারা, ২/৮)*; ত্বাবারানী, তাফসীরে ইবনু জারীর, ১/২৬৮-২৭২।

৪. দেখুন : লেখক কতৃর্ক অনুদিত, কাযিয়াতুত তাকফীর, পৃ. ৬৮ ও ১৩২-১৩৪।

৫. আল-ক্বামুসূল মুহীত্ব, (ز) অধ্যায়, (قاف) অনুচ্ছেদ, পৃ. ১১৫১।

স্তরের তারতম্য রয়েছে। কারণ আল্লাহ কুফরী বৃদ্ধির সংবাদ দিয়েছেন। যেমনিভাবে তাঁর বাণীতে ঈমান বৃদ্ধির সংবাদ দিয়েছেন, ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ 'নিশ্চয়ই কোনো মাসকে পিছিয়ে দেওয়া কুফরী বৃদ্ধি করে' *(আত-তওবা ৯/৩৭)*। আর ছালাত ও অন্যান্য রুকন পরিত্যাগকারী অথবা কবীরা গুনাহকারীদের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। যেমনটি তিনি তাঁর বাণীতে আখেরাতে কতক কাফেরের উপর আযাব বৃদ্ধির সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ 'যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিয়েছে, আমি তাদেরকে শাস্তির উপর শাস্তি বাড়িয়ে দিব' *(আন-নাহল ১৬/৮৮)*।

সুতরাং এই মূলনীতিটি জানা উচিত। কেননা এই বিষয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'ঈমান ও কুফরীর বিষয়াবলি' সম্পর্কে যারা কথা বলেন, তাদের অধিকাংশই প্রবৃত্তির অনুসারীদের কাফের আখ্যা দেওয়ার কারণে এই বিষয়টি লক্ষ্য করেননি এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হুকুম বা বিধানের মধ্যে পার্থক্য করেননি। অথচ এটা ও ঐটার মধ্যে পার্থক্য কুরআন, মুতাওয়াতির হাদীছ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এটি চিন্তা-ভাবনা করবে, সে জানতে পারবে যে, অধিকাংশ প্রবৃত্তি ও বিদআতের অনুসারীগণ কখনো কখনো হয় ভুলকারী মুমিন, নবী করীম ﷺ-এর আনীত কিছু বিধান হতে পথভ্রষ্ট অজ্ঞ। আর কখনো কখনো হয়, মুনাফেক্ব, যিন্দীক্ব যা গোপন করে তার বিপরীতটি প্রকাশ করে'।[৬]

২. নিফাক্বের প্রকারসমূহ :

নিফাক্ব দুই প্রকার : (نفاق دون نفاق) 'বড় নিফাক্ব ও ছোট নিফাক্ব। অথবা এক প্রকার নিফাক্ব যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং আরেক প্রকার নিফাক্ব যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না'।[৭]

(ক) বড় নিফাক্ব : তা হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, শেষ দিবস ও তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান প্রকাশ করা এবং উক্ত ঈমানকে ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ গোপন রাখা। এটা এমন মুনাফেক্বী, যা নবী করীম ﷺ-এর যুগে ছিল। কুরআন এই মুনাফেক্বদের নিন্দা করেছে এবং কাফের আখ্যা দিয়েছে আর জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে'।[৮]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বড় নিফাক্বের কিছু চিত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'নিফাক্বের মধ্যে কিছু বড় নিফাক্ব আছে, এ প্রকারের মুনাফেক্ব জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও এরকম ব্যক্তিদের নিফাক্ব। এই প্রকার নিফাক্ব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বা তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অস্বীকার করা বা ঘৃণা করা। অথবা তার প্রতি আবশ্যিক আনুগত্য বিশ্বাস না করা বা তাঁর দ্বীনকে নিচে নামানোর অপচেষ্টা করা হলে তাতে আনন্দিত হওয়া বা তাঁর দ্বীন বিজয় হওয়ার কারণে খারাপ লাগা। এই প্রকার মুনাফেক্ব বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর শত্রু। এই পরিমাণ নিফাক্ব আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে ছিল ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পরেও সবসময় ছিল। বরং রাসূল ﷺ-এর পরে তাঁর যুগের চাইতে অধিক পরিমাণে ছিল'।[৯]

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বিশ্বাসের দিক থেকে নিফাক্ব ছয় প্রকার: যথা— (১) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু অংশকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, (৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘৃণা করা, (৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশকে ঘৃণা করা, (৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীনকে ছোট করার অপচেষ্টা করা হলে তাতে আনন্দিত হওয়া এবং (৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীন বিজয়ী হওয়াকে অপছন্দ করা। সুতরাং এই ছয় প্রকারের নিফাক্ব সম্পাদনকারী জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে'।[১০]

এই দুই ইমাম যা উল্লেখ করলেন, তা থেকে বড় নিফাক্বের কতগুলো প্রকার ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।
(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু অংশকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।
(৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘৃণা করা।
(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু অংশকে ঘৃণা করা।
(৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীনকে ছোট করার অপচেষ্টা করা হলে তাতে আনন্দিত হওয়া।
(৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীন বিজয়ী হওয়াকে অপছন্দ করা।
(৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা সংবাদ দিয়েছেন, তা সত্যায়ন করার আবশ্যিকতা বিশ্বাস না করা।
(৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আদেশ করেছেন, তার আনুগত্য করার আবশ্যিকতা বিশ্বাস না করা।

এরকম আরো কিছু নিফাক্ব রয়েছে, কুরআনুল কারীম ও পবিত্র সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, সেগুলো বড় নিফাক্ব, যেগুলো ইসলাম থেকে বের করে দেয়'।[১১]

(চলবে)

---

৬. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, ৭/৪৭১।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ১/৩৪৭-৩৫৯।
৮. ইমাম ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ), জামেউল ইলম ওয়াল হিকাম, ২/৪৮০; ইবনুল ক্বাইয়িম, ছিফাতুল মুনাফেক্বীন, পৃ. ৪।
৯. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮/৪৩৪।
১০. শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়া এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ), মাজমূআতুত তাওহীদ, পৃ. ৭।
১১. ড. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-উহায়বী, নাওয়াক্বিযুল ঈমান আল-ই'তিক্বাদিয়া ওয়া যাওয়াবিতুত তাকফীর ইনদাস সালাফ, ২/১৬০।

তাক্বওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম

-মাহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মানে আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণ। একমাত্র আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণ করাই ইসলাম। একজন মুমিন বিশ্বাস করে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, নিয়ন্ত্রণকারীও তিনি এবং সবই একমাত্র তাঁর অধীনে। এজন্য একজন মুসলিম আল্লাহর ইচ্ছায় বাঁচতে আগ্রহী এবং তার সন্তুষ্টির জন্য মরতেও আগ্রহী। সে মনে করে, তার নিজের দখলে যা আছে এবং অন্য মানুষের দখলে যা আছে সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষের কাছে এ সবকিছু আল্লাহর আমানত। আমানত থেকে ব্যয় করার স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছে। তবে আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে। জবাবদিহিতার ভয়ের নামই তাক্বওয়া।

জবাবদিহিতার ভয়ে 'তাক্বওয়া' তথা আল্লাহভীতি নিয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে তার চরিত্র নির্মল ও নিষ্কলুষ না হয়ে পারে না। সে কুচিন্তা হতে তার মনকে দূরে রাখে। মস্তিষ্ককে খারাপ চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। চোখ ও কানকে কুদৃষ্টি ও অসৎ শ্রবণ থেকে সংযত রাখে। সে কখনো অশ্লীল কথা বলে না। হারাম খাদ্য না খেয়ে উপবাসকে প্রাধান্য দেয়। যুলুমের প্রতি তার হাত ওঠে না, অন্যায়ের পথে পা চলে না। অসত্যের কাছে মাথা নত করে না। তার ভেতরে ঘটে সততা, মহত্ত্ব ও মানবতার সমাবেশ।

একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় আশাবাদী। কখনই সে নিরাশ ও হতাশ হয় না। আল্লাহর উপর থেকে নির্ভরশীলতা হারায় না। সে শোকর করে, ছবর করে। এ বিশ্বাসই তাকে মুত্তাক্বী তথা আল্লাহভীরু করে তোলে। সে প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে। এ অনুভূতি মানুষকে সবরকম পাপচিন্তা ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। প্রকৃতপক্ষে 'তাক্বওয়া' থেকে উৎসারিত সৎগুণাবলিই সত্যিকারের সৎগুণ। যার মধ্যে 'তাক্বওয়া' থাকে তার মধ্যে—(ক) সত্যবাদিতা (খ) সহিষ্ণুতা (গ) শোকর (ঘ) ইহসান (ঙ) কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সৎগুণের সমাবেশ ঘটে থাকে।

তাক্বওয়ার পরিচয় :

'তাক্বওয়া' শব্দের অর্থ আল্লাহভীতি, পরহেযগারিতা, আত্মশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, নিজেকে সব রকম বিপদ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার ভয়ে সবরকম অন্যায়, অনাচার, পাপাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশমতো পূত-পবিত্র জীবনযাপন করাকে 'তাক্বওয়া' বলে।

যার মধ্যে 'তাক্বওয়া' আছে সে আল্লাহর ভয়ে পাপকাজ, পাপচিন্তা থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত' *(আন-নাযিআত, ৭৯/৪০-৪১)*।

মুত্তাক্বীর পরিচয় :

যে ব্যক্তি তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়, তাকেই মুত্তাক্বী বলে। তাক্বওয়া মুমিন জীবনের ভূষণ। আজকের সমাজে মুত্তাক্বীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। জাহেলিয়াত মিশ্রিত ছূফীবাদই এ বিভ্রান্তির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এরা তাক্বওয়ার অধিকারী বলতে এমন একদল মানুষকে হাযির করে, যারা এক বিশেষ ধরনের পূতিগন্ধময় বস্ত্র শরীরে জড়িয়ে রেখেছে, হাতে রয়েছে মোটা দানাযুক্ত তাসবীহর একটি ছড়া, যাদের চক্ষুগুলো অর্ধ-মুদিত, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ব্যাপারে তারা নির্লিপ্ত। এমনকি সমাজের জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত ত্বাগূতেরা এদের খাদেম। তারা কীসের মুত্তাক্বী!

মুত্তাক্বীদের পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের সূরা আল-বাক্বারার শুরুতেই ইরশাদ করেছেন, ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ - أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 'এই সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাক্বীদের জন্য। যারা গায়েবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ছালাত ক্বায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক্ব দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত আর তারাই যথার্থ সফলকাম' *(আল-বাক্বারা, ২/২-৫)*।

উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমা থেকে বুঝা যায়, হেদায়াত গ্রহণ করা সেসব মুত্তাক্বীর পক্ষেই সম্ভব, যাদের গুণাবলি হবে— (ক) গায়েবের উপর বিশ্বাস করা, (খ) ছালাত ক্বায়েম করা, (গ) আল্লাহর দেওয়া রিযিক্ব থেকে তাঁর পথে ব্যয় করা, (ঘ) পূর্বের ও পরের কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা এবং (ঙ) পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা।

তাক্বওয়ার সোপান বা স্তর :

গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) তাক্বওয়ার ৪টি সোপান বা স্তর উল্লেখ করেছেন। যেমন—

(১) হারাম বর্জন : ইসলামী শরীআতে যেসব বস্তু হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলোকে বর্জন করা। যেমন— মদ, জুয়া, সূদ, ঘুষ ইত্যাদি। এই শ্রেণির তাক্বওয়া অবলম্বনকারীকে মুমিন বলে।

(২) সন্দেহযুক্ত হালাল বর্জন : হারাম বস্তু বর্জন করার পর সন্দেহযুক্ত হালাল বর্জন করা। কারণ এটা থেকে বিরত না থাকলে হারামে পতিত হওয়ার ভয় থাকে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত বস্তু বর্জন করো এবং সন্দেহবিহীন বস্তু গ্রহণ করো'।[১] এ স্তরের তাক্বওয়া অবলম্বনকারীকে ছলেহ বলে।

(৩) সন্দেহবিহীন হালাল বর্জন : সব রকম হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু বর্জন করার পর, সন্দেহবিহীন অনেক হালাল বস্তুও বর্জন করা। যেমন— অনেক আল্লাহর বান্দাহ আছেন, যারা ইচ্ছা করেই বেশি সুস্বাদু খাদ্য ও বেশি মূল্যবান পোশাক গ্রহণ করেন না এবং অন্যের নিকট হতে নিজের প্রাপ্য আদায় করার সময় কিছু কম এবং অন্যের প্রাপ্য দেওয়ার সময় কিছু বেশি দিয়ে থাকেন।

(৪) ইবাদতে সহায়কহীন বস্তু বর্জন করা : সেই সকল হালাল বস্তু বর্জন করা, যা ইবাদতে সহায়তা করে না। এই স্তরের তাক্বওয়া অবলম্বনকারীকে ছিদ্দীক্বীন বলা হয়। এটি তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

তাক্বওয়া থেকে উৎসারিত গুণাবলি :

তাক্বওয়া থেকে উৎসারিত গুণাবলি নিম্নরূপ :

(১) সত্যকথা বলা : সত্য কথা বলা তাক্বওয়ার একটি গুণ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো' *(আত-তওবা, ৯/১১৯)*।

(২) মিথ্যা কথা না বলা : তাক্বওয়ার অধিকারী ব্যক্তির আরেকটি গুণ মিথ্যা কথা না বলা। মিথ্যা বলা মহাপাপ। মিথ্যাবাদী আল্লাহর কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি। দুনিয়ার মানুষের কাছেও নিন্দিত। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

বাহয ইবনু হাকীম (রযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ধ্বংস ও বিফলতা সে ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য রয়েছে ধ্বংস, তার জন্য রয়েছে অমঙ্গল'।[২]

(৩) ছবর বা ধৈর্যধারণ করা : ছবর তাক্বওয়া অর্জনকারীর আরেকটি গুণ। গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) ছবরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

ক. ইবাদতে ছবর : নিয়মিত ইবাদত করা সত্যিই কষ্টকর ব্যাপার। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়।

খ. বিপদাপদে ছবর : সুখ-দুঃখ, বিপদাপদ মানবজীবনের নিত্য সঙ্গী। ধৈর্যের সাথে বিপদাপদের মোকাবিলা করতে পারলে মুমিনের মর্যাদা বাড়ে।

গ. পাপ কাজ পরিত্যাগে ছবর : শয়তান মানুষকে পাপ কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে। এসময় ধৈর্যের খুবই প্রয়োজন।

ঘ. যুলুম-অত্যাচারে ছবর : সত্য, ন্যায় ও ধর্মের পথে নানা রকম যুলুম-অত্যাচার ও বাধা-বিপত্তি আসে। ধৈর্যের সাথে এসবের মোকাবিলা করাই প্রকৃত মুমিনের কাজ।

ঙ. সুখে ও আনন্দে ছবর : অনেক সময় মানুষ সুখ ও সফলতার আনন্দে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত হয়। এসময় ছবর করা একান্ত কর্তব্য।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তি ও বাইরের শত্রুর মোকাবেলায় ধৈর্যধারণ করো। ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা করো এবং সীমান্তের শত্রুদের মোকাবেলার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা তোমাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পার' *(আলে ইমরান, ৩/২০০)*।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৭ নং পৃষ্ঠায়)

১. তিরমিযী, হা/২৫১৮; আহমাদ, হা/১২৫৫০।

২. আবূ দাঊদ, হা/৪৯০৫; তিরমিযী, হা/২৩১৫।

দুর্নীতির ভয়াবহতা

-মাহবূবুর রহমান মাদানী*

দুর্নীতি (Corruption) শব্দটি নেতিবাচক। এর বিপরীত শব্দ ‘সুনীতি’। দুর্নীতি শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো রীতি বা নীতিবিরুদ্ধ আচরণ, কুনীতি, অসদাচরণ ও নীতিহীনতা ইত্যাদি। দুর্নীতি দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আদর্শের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অসাধুতা বা বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। বৃহৎ পরিসরে ঘুষ প্রদান, সম্পত্তির আত্মসাৎ এবং সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে প্রতিটি নাগরিকের হক্ব বা অধিকার জড়িত রয়েছে। কাজেই যে লোক তা অন্যায়ভাবে নিজের কুক্ষিগত করলো, সে বস্তুত শত-সহস্র লোকের অধিকার হরণ করলো। যদি কোনো সময় তার মনে তা সংশোধন করার ইচ্ছা হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। একবার রাসূল ﷺ যার কাছে যা গনীমতের মাল রয়েছে, তা নিয়ে আসার জন্য বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মাধ্যমে তিনবার ঘোষণা করেন, তারপর তিনি গনীমতের মাল বণ্টন করে দেন। এরপর এক ব্যক্তি চুলের দড়ি নিয়ে আসেন। রাসূল ﷺ তাকে বলেন, তুমি কি বেলালের ঘোষণা শোনোনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি। রাসূল ﷺ তাকে বলেন, তবে তুমি তখন নিয়ে আসোনি কেনো? তখন তিনি ওযর পেশ করলেন। রাসূল ﷺ বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়ো, আমি তোমার থেকে এসব কখনই গ্রহণ করব না’।[১] মসজিদ, মাদরাসা এবং ওয়াক্বফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার হাজার মুসলিমদের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। রাসূল ﷺ বলেন, مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ‘আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি, সে যদি ভাতা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে তা হবে আত্মসাৎ বা অসৎ উপায় অবলম্বন করা’।[২]

দুর্নীতির বিধান : শরীআতে এ ধরনের অপরাধ করা কাবীরা গুনাহ ও হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতির সম্পদ থেকে দান করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং তা পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে।

দুর্নীতির কুফল : ১. দুর্নীতিকারীকে পরকালে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করা হবে। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন সে তার আত্মসাৎকৃত সম্পদ পিঠে নিয়ে উপস্থিত হবে। ২. দুর্নীতিকারীর জন্য ইহকাল ও পরকালে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। ৩. দুর্নীতি দুর্নীতিবাজকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ৪. দুর্নীতি করা মুনাফিক্বের অন্যতম নিদর্শন।

দুর্নীতির প্রকার : ১. গনীমতের মালে দুর্নীতি করা, ২. যাকাতের মালে দুর্নীতি করা, ৩. জনসাধারণের মাল আত্মসাৎ করা, ৪. কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা, ৫. জায়গা-জমি জবরদখলের মাধ্যমে দুর্নীতি করা প্রভৃতি।

দুর্নীতির কারণ :

(১) তাক্বওয়ার অভাব ও লজ্জা না থাকা : মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও লজ্জা না থাকার কারণে সে যে কোনো ধরনের খারাপ কাজ করতে দ্বিধা করে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ‘অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ একথা জানতে পেরেছে যে, যখন তোমার লজ্জা না থাকবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে’।[৩]

(২) দ্রুত ধনী হওয়ার লালসা : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার বলছি, কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে’ *(আত-তাকাছুর, ১০২/১-৫)*। রাসূল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার বরকতসমূহ খুলে দেওয়া হবে’। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! দুনিয়ার বরকত কী? তিনি বললেন, ‘দুনিয়ার বরকত হলো দুনিয়ার চাকচিক্য’।[৪]

(৩) লোভ ও তৃপ্তিহীনতা : মানুষের মধ্যে যদি সম্পদের অতৃপ্ত লোভ-লালসা থাকে, তাহলে সে দুর্নীতি করে সম্পদ উপার্জন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তখন হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করতে থাকে।

দুর্নীতির ক্ষেত্র :

(১) স্বজনপ্রীতি : নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি হলো কোনো কাজে

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৮৫৮।

২. আবূ দাঊদ হা/২৯৪৩, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৩৭৪৮।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৮৪।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪২৭।

যোগ্য লোককে নিয়োগ না দিয়ে নিজের আত্মীয় বা নিজের পছন্দসই লোক হওয়ার কারণে অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেওয়া।

(২) ঘুষ গ্রহণ : অবৈধ পন্থায় কোনো কাজ করে দেওয়ার জন্য ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ করা। ঘুষ আদান-প্রদান সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন, لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي 'ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের ওপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ রয়েছে'।[৫] আবূ উমামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا 'যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল এবং সেই সুপারিশের প্রতিদানস্বরূপ তাকে কিছু উপহার দিল। যদি সে তা গ্রহণ করে তাহলে সে সূদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হলো'।[৬] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, 'রাসূল ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার উপর অভিসম্পাত করেছেন'।[৭]

(৩) ক্ষমতার অপব্যবহার : জোরপূর্বক কোনো অবৈধ কাজ করাকে ক্ষমতার অপব্যবহার বলে। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে, অতঃপর তাদের ওপর কাউকে পক্ষালম্বন করে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে, তবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত। তার কাছ থেকে আল্লাহ ফরয-নফল কোনো নেক আমল গ্রহণ করবেন না। এমনকি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন'।[৮]

(৪) সরকারি সম্পদ দখল করা : অন্যায়ভাবে সরকারের সম্পদ ভোগ করা। সরকারি সম্পদ কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়; বরং তাতে রয়েছে সকলের অধিকার। তাই এ মাল অন্যায়ভাবে যে ভোগ করল, সে সকলের অধিকার নষ্ট করল। তাই এটি বড় গুনাহ। এতে দখলকারী পরকালে রাসূল ﷺ-এর শাফাআত তথা সুপারিশ পাবে না। তেমনিভাবে সে হবে জাহান্নামী।

দুনিয়াতে দুর্নীতিবাজের শাস্তির হুকুম বা বিধান : ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি সরকারি মাল থেকে কোনো কিছু আত্মসাৎ করে, অতঃপর তার কাছে তা পাওয়া যায়, তাহলে তার কাছ থেকে সেই সম্পদ গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ভর্ৎসনা সহকারে শাস্তি দেওয়া হবে।

দুর্নীতিবাজের পরকালীন শাস্তি : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ 'আর কোনো নবীর জন্যে এটা সঙ্গত নয় যে, তিনি গনীমতের মাল আত্মসাৎ করবেন। আর যে ব্যক্তি গনীমতের মাল আত্মসাৎ করবে, সে যে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে তা নিয়ে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, অতঃপর প্রত্যেককে পরিপূর্ণভাবে তা-ই দেওয়া হবে, যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের উপর আদৌ যুলুম করা হবে না' *(আলে ইমরান, ৩/১৬১)*।

কোনো নবী আলাইহিস সালাম-এর জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তিনি কোনো গনীমতের মাল আত্মসাৎ করবেন। কারণ কোনো জিনিস গোপন করা বা আত্মসাৎ করা পাপের কাজ। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল নবী আলাইহিস সালাম কে পাপমুক্ত রেখেছেন।

উক্ত আয়াত অবতীর্ণের পেক্ষাপট হলো, বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্যে থেকে একটি লাল চাদর পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন কোনো লোক বলল, হয়তো সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ﷺ-এর পরিবার ও জিনিসপত্রের দায়িত্বে এক লোক ছিলো, তাকে 'কারকারাহ' বলা হতো, সে মারা গেলে, রাসূল ﷺ বলেন, هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا 'সে জাহান্নামী'। অতঃপর লোকজন তাকে দেখতে গিয়ে পায় যে, সে একটি আলখেল্লা চুরি করেছে।[১০] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, '(হে মানুষ সকল!) তোমাদের মধ্যে যাকে আমরা কোনো কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর সে যদি একটি সুঁই অথবা এর চেয়ে ছোট বা বড় কোনো কিছু আমাদের থেকে গোপন করে, তবে তা খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে এবং সে ক্বিয়ামতের দিন তা সাথে নিয়ে আসবে'।[১১]

দুর্নীতি থেকে পরিত্রাণের উপায় : ১. অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি সৃষ্টি করা, ২. অল্পে তুষ্ট হওয়া, ৩. লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকা, ৪. ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ৫. পরকালের জবাবদিহিতা ও শাস্তির ভয় অন্তরে জাগ্রত করা।

পরিশেষে বলবো, দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। আমাদের চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য দুর্নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। যে জাতির মধ্যে দুর্নীতি যত কম, তারা তত বেশি সফল। সর্বোপরি ক্বিয়ামতের দিন আমরা যেন আল্লাহর দরবারে দুর্নীতিমুক্ত, সচ্চরিত্রবান হয়ে উপস্থিত হতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৫. ইবনু মাজাহ, হা/২৩১৩, হাদীছ ছহীহ।
৬. আবূ দাঊদ, হা/৩৫৪১, হাসান।
৭. আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০, হাদীছ ছহীহ; তিরমিযী, হা/১৩৩৭।
৮. মুসতাদরাক হাকেম, হা/৭০২৪।
৯. তিরমিযী, হা/৩০০৯; আবূ দাঊদ, হা/৩৯৭১।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৩০৭৪।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৩।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র মাধুরী

-নাজমুল হাসান সাকিব*

মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। আল-কুরআনই হলো তাঁর জীবনাদর্শ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'তিনি ছিলেন আল-কুরআনের মূর্ত প্রতীক'।[১] তিনি তাঁর জীবনে আল-কুরআনের প্রতিটি অনুশাসনের রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। এজন্য তাঁকে 'জীবন্ত কুরআন'ও বলা হয়।

জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর মাঝে বিরাজ করছিল সর্বোত্তম চরিত্র মাধুরী, সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বভাব ছিল কলুষতা, কঠিনতা ও কর্কশমুক্ত। নম্রতা ছিল তাঁর প্রধান হাতিয়ার। তিনি ছিলেন দয়াশীল, সহনশীল ও সহানুভূতিশীল এবং সর্বমহলে বিশ্বস্ত। ওয়াদা পূরণ বা অঙ্গীকার পালন করা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পালন না করাকে তিনি জঘন্যতম পাপ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন, لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ 'যে অঙ্গীকার পালন করে না তার ধর্ম নেই'।[২] তাই তিনি নির্দেশ দেন, 'তোমরা যখন অঙ্গীকার করবে, তখন তা পালন করবে'।[৩]

ব্যক্তিগতভাবে ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালনে তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ ও নির্ভেজাল। তাই তো অতি অল্প বয়সেই তিনি 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত হন। ছাহাবী কবি হাসসান ইবনে ছাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আবৃত্তি করে বলেন,

وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني.... وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ
خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ.... كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

'আপনার চেয়ে সুন্দর আমার দু'চোখ কাউকে কখনো দেখেনি, আপনার চেয়ে সুন্দর সন্তান কোনো নারী কখনো জন্ম দেয়নি। আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করে। হে আল্লাহ! আপনি যেমন চেয়েছেন ঠিক তেমন করেই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন'।[৪]

কবির এই কবিতাই বলে দিচ্ছে কেমন ছিলেন তিনি। কেমন ছিল তাঁর অনুপম আদর্শের সৌন্দর্য। অনুভব করার বিষয়। এজন্য তাঁর উন্নত আদর্শের স্বীকৃতি দিয়েছেন মহান আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 'নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী' *(আল-ক্বলম, ৬৮/৪)*।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে শুরু থেকেই সুন্দর ভূষণে নিরন্তর বিভূষিত করেছিলেন। অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা বালা-মুছীবতে সহ্য ও স্থিরতা ছিল আখলাকে নববীর অনন্য ভূষণ। প্রত্যেক ধৈর্য ও সহনশীল লোকদের জীবন-বৃত্তান্ত খুঁজে দেখলে তাতে অবশ্যই কোনো না কোনো বিকৃতি বা ফাঁকফোকর পাওয়া যাবে। কিন্তু এর বিপরীতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র মাধুরী ছিল এতটা নির্মল ও নির্ভেজাল যে, তাঁর ওপর শত্রুদের পক্ষ থেকে যুলম-অত্যাচারের মাত্রা যতটা বেড়ে গিয়েছিল ঠিক তাঁর সহিষ্ণুতা আর স্থিরতার চরম সীমাও ততটা বিরল ইতিহাসের জন্ম দিয়ে যাচ্ছিল। আরবের মূর্খ মানুষগুলোর সীমালঙ্ঘনের পরিধি যতটা বেড়েছিল তাঁর সহনশীলতার পরিধিও ততটা বিস্তৃত হয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, যে কোনো ক্ষেত্রে যখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দু'টি পথ খোলা থাকত, তখন তিনি বারবার সহজ পথটিই অবলম্বন করতেন যতক্ষণ না গুনাহের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। কারণ যে কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দূরে। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে তিনি কখনো কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হলে সে ক্ষেত্রে তিনি প্রতিশোধ নিতে দ্বিধায় ভুগতেন না।[৫]

রাগ আর ক্রোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সংযমী। আর রাযী ও সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। রাগ শয়তানের কুমন্ত্রণার অংশ বিশেষ বলে তিনি কখনো রাগ করতেন না। এজন্যই তিনি এক আগন্তুক ব্যক্তিকে উত্তম নছীহত হিসেবে বলেন, 'রাগ করো না'। এমনটি তিনি তিন বার বলেছেন।[৬]

তবে পূর্বে যে বিষয়টি বলা হয়েছে, নিজের স্বার্থে তিনি কখনো কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করেননি। কিন্তু আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হলে সে ক্ষেত্রে তিনি প্রতিশোধ নিতে দ্বিধায় ভুগতেন না। তা আপন জায়গায় বহাল থাকবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে মেরেছেন এমনটি হয়নি। নিজের স্ত্রীদের বেলায়ও না; এমনকি কোনো সেবক, কর্মচারীর ক্ষেত্রেও না। তবে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর জন্য বেঈমানদের উপর আক্রমণ করেছেন। কেউ তাকে কষ্ট দিলে তিনি তার থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। তবে শরীআতের কোনো হুকুম লঙ্ঘন করলে দোষী হিসেবে তাকে শাস্তি দিতেন।[৭]

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদান্যতা ছিল তাঁর অন্যতম জীবনাদর্শ।

দাওরায়ে হাদীছ (মাস্টার্স), ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা; অধ্যয়নরত (ইফতা), আল-মারকাজুল ইসলামী কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৩৪১; জামেউছ ছাগীর, হা/৮৯৪২।
২. মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৪০৬; ইবনু হিব্বান, হা/১৯৪; মিশকাত, হা/৩৫।
৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪৭০; জামেউছ ছাগীর, হা/১৮৯৮।
৪. দিওয়ানু হাসসান ইবনে ছাবিত, পৃ. ২১।
৫. ছহীহ বুখারী, ১/৫০৩।
৬. ছহীহ বুখারী, ১/৯০৩।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩২৮; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৮৫।

দয়া ও দানশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। নিজের কাছে কিছু থাকলে তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না।

মূসা ইবনু আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কখনো এমন হয়নি যে, কেউ তার কাছে কিছু চেয়েছে আর তা তিনি দেননি। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি বকরি চাইলে তিনি তাকে এত বেশি পরিমাণ দান করলেন, যা দুই পাহাড়ের মধ্যস্থান পূর্ণ করে দেবে। অতঃপর লোকটি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে বললেন, হে সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মাদ এত বেশি দান করেছেন যে, তিনি নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয় করেন না।[৮]

কথাবার্তা, মতপ্রকাশ ও কোনো কাজ করতে যাওয়ায় সাহসিকতা প্রদর্শন একটি চমৎকার গুণ। যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তিনি ছিলেন সকল মানুষের চেয়ে বেশি সাহসী। বীর সিপাহী আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন যুদ্ধ শুরু হতো তখন আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আড়াল নিয়ে আত্মরক্ষা করতাম। তিনি থাকতেন আমাদের মধ্য থেকে শত্রুদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে।

নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বোত্তম আদর্শের অন্যতম ছিল তাঁর লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের এক মহান ভূষণ। লজ্জাশীলতা সম্পর্কে তিনি বলেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ। 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'।[৯] বস্তুত মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি বাণী, কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচরণ এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনাও তৎপরবর্তী বিশ্ববাসীর জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, উৎকর্ষতম, অনুসরণীয় আদর্শ। একটি অনুপম আদর্শ ও চরিত্রের যতগুলো মহৎ গুণ প্রয়োজন, মানব হিতৈষী বিশ্বনেতা মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রে তার সবগুলোরই অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর উৎকর্ষতম আদর্শের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলামের শান্তির পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁর আদর্শে নিজেদের জীবনকে উজ্জ্বল করে গড়ে তুলেছিল। মানব জীবনের প্রতিটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য শ্রেষ্ঠতম ও অনিন্দ্য সুন্দর অনুসরণীয় আদর্শ উপহার দিয়ে গেছেন, যা প্রতিটি যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

উপরিউক্ত আলোচনায় বর্ণিত নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যার পক্ষে পবিত্র কুরআনুল কারীমও একই কথা বলেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণ করবে অবশ্যই তারা হেদায়াত পাবে। আর ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করবে।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩১২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৭৩০।

৯. ইবনু মাজাহ, হা/৫৮; নাসাঈ, হা/৫০০৬।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দারুস সুন্নাহ বালিকা মাদরাসা (স্থাপিতঃ ১৪৩৯হি./২০১৭ ঈ.)

উত্তম বানিয়া পাড়া, সিও বাজার, রংপুর মহানগর, রংপুর।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ক্র নং	পদের নাম	সংখ্যা	চাকুরীর ধরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন
১	**সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকা** (আরবী) রংপুর শাখা-৩ জন	৩	আবাসিক ফুলটাইম	দাওরা পাশ	সর্বনিম্ন বেতন ১২,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
২	**সহকারী শিক্ষিকা** ইংরেজী-১, গণিত-১	২	অনাবাসিক/ পার্ট-টাইম	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার্স	সর্বনিম্ন বেতন ৮,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
৩	**হাফেজা** রংপুর শাখা- ২জন, হারাগাছ শাখা- ১জন	৩	আবাসিক ফুলটাইম	কুরআনের হাফেজা, ইয়াদ ভালো থাকতে হবে	সর্বনিম্ন বেতন ১০,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
৪	**নূরানী শিক্ষিকা** হারাগাছ শাখা-৩জন, রংপুর শাখা-২জন	৫	আবাসিক ফুলটাইম	আলিম/ফাজিল/কুরআনের হাফেজা/ নূরানী ট্রেনিং ও পাঠদানে বাস্তব অভিজ্ঞ হতে হবে	সর্বনিম্ন বেতন ৮,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
৫	**অফিস সহকারী** রংপুর- ১, হারাগাছ- ১	২	আবাসিক ফুলটাইম	ফাজিল/কামিল/দাওরা/স্নাতক/ডিগ্রী পাশ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে পারদর্শী হতে হবে।	সর্বনিম্ন বেতন ১০,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে

আবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ মাদাসারা পক্ষ থেকে বাসস্থান এবং খাবার সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীগণকে হারাগাছ ও রংপুর শাখায় চাকুরী করার মানসিকতা থাকতে হবে। আগামী ২০শে ডিসেম্বর /২৩ ইং তারিখের মধ্যে উল্লেখিত **Gmail Address: moshiur308057@gmail.com** পরিচালক/প্রিন্সিপাল বরাবর আবেদন পত্রের সহিত ২০০ টাকা বিকাশ নং- ০১৭১২-৫৯৩ ৬৮৩ সেন্ডমানি করে ট্রানজেকশন/রেফারেন্স আইডি নাম্বার আবেদন পত্রে উল্লেখ করে পাঠাতে হবে। লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাতকার ২২/১২/২৩ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় শুরু হবে ইংশা-আল্লাহ। শুধুমাত্র কৃতকার্য প্রার্থীকে টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে ।

নিয়োগ প্রকাশের তারিখ: ১০/১০/২০২৩

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মশিউর বিন মাহাতাব
০১৭১২-৫৯৩৬৮৩

বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন বয়সের আগ্রহী মেয়েদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানে ১বছর মেয়াদী "মা'হাদুল লুগাহ আল-আরাবিয়া" (আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স)-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

অধ্যক্ষ
মুয়াজ বিন জামাল মাদানী
০১৭১০-২৮৯০৯৭

আদর্শ দাঈর গুণাবলি

-আব্দুল কাইয়ূম বিন জাহাঙ্গীর আলম*

দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণের কাজ। আর নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর পরে তাঁদের সেই কাজগুলো বর্তমানে ইসলামের দাঈগণ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। একজন দাঈকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। নিচে সংক্ষেপে তাদের গুণাবলি আলোচনা করা হলো।

(১) যেদিকে আহ্বান করবে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা : দাওয়াতের বিষয়ে ঈমানের দৃঢ়তার উপর তার ফলাফল নির্ভরশীল। বিশ্বাস যত গভীর হবে, ফলাফল তত ভালো হবে। বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, ফলাফল তত কম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ ‘হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব (তাওরাত)-কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করুন’ *(মারইয়াম, ১৯/১২)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ ‘সুতরাং তা শক্ত করে ধরুন এবং আপনার কওমকে নির্দেশ দিন, যেন তারা গ্রহণ করে এর উত্তম বিষয়গুলো’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৪৫)*।

(২) যার দিকে আহ্বান করছে, তার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা : একজন দাঈর সাহায্য পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রমাণিত হবে দুটি জিনিসের মাধ্যমে। যথা—

(ক) দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিশুদ্ধতা : একজন দাঈ তার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। দুনিয়াবী কোনো উপকার আশা করবে না। ইখলাছের বিন্দু পরিমাণ কমতির কারণে উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে ফলাফল নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) আল্লাহর ভালোবাসা : যখন একজন দাঈ বেশি বেশি নফল ইবাদত, যিকির-আযকারে মশগূল থাকবে, অপছন্দনীয় বিষয় পরিহার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, তখন আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালোবাসবেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। সর্বাধিক প্রিয় জিনিস, যার মাধ্যমে বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে তা হলো, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এমনকি অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা প্রদান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে; সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়া অপছন্দ করি’।[১]

(৩) যেদিকে আহ্বান করবে সে বিষয়ে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা থাকা : সেই প্রকৃত আহলুল ইলম, যে দাওয়াতী কর্মকাণ্ডকে তার জ্ঞানের ও বিচক্ষণতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের কাজ জাহেলের কাছ থেকে আশা করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*।

(৪) ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং চলার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা : ঐ দাঈর কোনো ভালো ফলাফল আশা করা যায় না, যে ইলম অনুযায়ী আমল করে না এবং চলার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে না। আল্লাহর বাণী, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো’ *(আছ-ছফ, ৬১/২)*।

আমল থেকে ইলমকে পৃথক করার দুনিয়াবী প্রভাব : যদি দাঈ নিজে আমল না করে, তাহলে যাদের আহ্বান করা হয় তারা বলবে, তার কথা যদি উপকারী হয়, তাহলে সে নিজে কেন আমল করে না। তখন তার ডাকে কেউ সাড়া দিবে না। অথচ তার আমল যদি ইলম অনুযায়ী হতো, তাহলে আহ্বান ছাড়াই অনেক মানুষ তার অনুকরণ করত। কেননা মুখের কথার চেয়ে বাস্তব অবস্থার কথা বেশি উপকারী।

* দাওরায়ে হাদীছ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; আরবী শিক্ষক, মাদরাসাতুল হাসানাহ, সাভার, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

(৫) পরিপূর্ণ সচেতনতা : একজন দাঈকে তিনটি বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। তা হলো—
(ক) যুগের চাহিদা অনুযায়ী দাওয়াতের বাস্তবতা।
(খ) তার আশেপাশের আহূত ব্যক্তির অবস্থা।
(গ) দাঈর নিজের অবস্থা এবং যে পরিস্থিতি তাকে বেষ্টন করে রেখেছে তার অবস্থা।

(৬) কর্মপদ্ধতিতে প্রজ্ঞা অবলম্বন : একজন দাঈকে তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই প্রজ্ঞাবান হতে হবে। অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী সর্বোত্তম পদ্ধতিতে যথাস্থানে প্রয়োগ করার নামই প্রজ্ঞা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৯)*।

(৭) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈর জন্য উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের ব্যাপারে বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ‘নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী’ *(আল-ক্বালাম, ৬৮/৪)*।

(৮) মুমিনদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা : একজন দাঈ অবশ্যই সমস্ত মুসলিমের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবেন। দাঈ তার বাহ্যিক অবস্থার প্রতি নির্ভর করবে এবং গোপন বিষয়গুলো আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই কিছু ধারণা পাপ’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*।

(৯) মানুষের নিকট থেকে তাদের দোষত্রুটি গোপন করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ‘যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির দোষ গোপন করবে, মহান আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন দুনিয়াতে ও আখিরাতে’।[২]

(১০) ভালো-মন্দ অবস্থা বিবেচনা করে মানুষের সাথে মেশা : দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যক বিষয় হলো মানুষদের কল্যাণের পথে আহ্বান করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে তাদের সঙ্গে মেশা। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ‘যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের থেকে পাওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে, সে উত্তম ঐ মুমিনের চেয়ে যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের থেকে পাওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণও করে না’।[৩]

তবে মেলামেশার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ ‘যখন আপনি দেখবেন সেসব লোককে, যারা আমার আয়াত নিয়ে সমালোচনা করছে, তখন আপনি তাদের থেকে সরে পড়ুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়’ *(আল-আনআম, ৬/৬৮)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের মাঝে সর্বপ্রথম যে ঘাটতি প্রবেশ করে, তা হলো তাদের আলেমদের নিয়ন্ত্রণহীনভাবে খারাপ লোকদের সাথে মেশা। এটা তো স্পষ্ট বিষয় যে, একজন ডাক্তার যখন কোনো রোগীর চিকিৎসা করেন, তখন তিনি রোগের জীবাণু থেকে নিজেকে সর্তকতার সাথে সংরক্ষণ করেন। আর তা না হলে চিকিৎসক নিজেই রোগে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন।

(১১) মানুষদেরকে যথাযথ মর্যাদা দান এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানের স্বীকৃতি প্রদান : হাদীছে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ‘সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না’।[৪]

সুতরাং একজন দাঈর জন্য আবশ্যক হলো, তিনি মানুষের মান-মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং মানুষদেরকে যথাযথ স্থানে স্থান দিবেন। কারণ মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সম্মানের স্বীকৃতি শুধু মর্যাদাবান ব্যক্তিরা দিতে পারেন।

(১২) অন্য দাঈদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, পরস্পর পরামর্শ করা ও কল্যাণ কামনা করা : আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ তোমরা তাক্বওয়া এবং ভালো কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো’ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। এই আদব রক্ষা করলে দাঈদের পারস্পরিক ভালোবাসা গভীর হবে, তাদের নিজেদের অকল্যাণগুলো দূরীভূত হবে এবং প্রত্যেকেই নিজ মতের ওপর সন্তুষ্ট থাকার মতো ধ্বংসাত্মক সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল দাঈকে এই বিষয়গুলো জেনে-বুঝে সঠিকভাবে পরস্পরের মধ্যে মিলেমিশে দাওয়াতী কাজ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯, হাদীছ ছহীহ।
৩. ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩২, হাদীছ ছহীহ।
৪. তিরমিযী, হা/১৯১৯, হাদীছ ছহীহ।

মানবদেহের সৃষ্টি রহস্য

-মো. হারুনুর রশীদ*

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ - وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ‘বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলি রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি দেখতে পাও না?’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/২০-২১)*।

মানবদেহের কী কী নিদর্শন সমগ্র দেহকে সুগঠিত করেছে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল মানবদেহেরে জন্য উপকারী অথবা সম্ভাব্য উপকারী হিসেবে ৬১টি উপাদান তালিকাভুক্ত করেছেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দুনিয়াতে বিদ্যমান ১১৮টি উপাদানের মধ্যে মানবদেহে ৯৪টি উপাদান রয়েছে, তন্মধ্যে ৬১টি উপাদানের মাত্রা জানা যায়। বাকী ৩৩টি উপাদান মানবদেহে কী পরিমাণে বা কী মাত্রায় রয়েছে, তা জানা যায় না।[১] এসব উপাদানের মধ্যে ছয়টি উপাদান মানবদেহের ৯৯% ভর দখল করে আছে। অক্সিজেন ৬৫%, কার্বন ১৮.৫%, হাইড্রোজেন ১০%, নাইট্রোজেন ৩.২%, ক্যালসিয়াম ১.৫% ও ফসফরাস ১.০%। পটাসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন এবং ম্যাগনেসিয়াম— এই পাঁচ উপাদান মাত্র ০.৮৫% ভর ধারণ করে। এই মোট ১১টি উপাদানকে মানবদেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়াও এক ডজনের বেশি উপাদানকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়। এগুলোকে ট্রেস উপাদান বলা হয়। মানবদেহে এদের মোট ওযন ১০ গ্রামেরও কম।[২]

বিস্ময়কর মানুষ সৃষ্টির উপাদান : প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তাআলা সরাসরি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে এ মাটিকে কাদামাটি, পোড়ানো শুকনো মাটি, মাটির নির্যাস ইত্যাদি অভিধায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলো ছিল মাটি থেকে আদম আলাইহিস সালাম-এর দেহ সৃষ্টি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়। আদম আলাইহিস সালাম-এর দেহ সৃষ্টির পর আল্লাহ সে দেহ থেকে হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুরুষ ও নারীর মিলনে উদ্ভূত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণে মানুষের জন্মলাভের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কেননা মানবদেহে যেসব উপাদান পাওয়া যায়, তার সবগুলো উপাদান মাটির মধ্যে বিদ্যমান। আমরা দেখেছি যে, পৃথিবীতে ১১৮টি উপাদান রয়েছে, তন্মধ্যে ২৬টি উপাদান দিয়ে মানবদেহ মৌলিকভাবে গঠিত। কুরআন বলছে, মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ মাটির সব উপাদান দিয়ে নয়, বরং মাটির উৎকৃষ্ট কিছু উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি তা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য। অনুরূপভাবে কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা জানি যে, পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত হয়। আমাদের দেহেও এই দুটি উপাদানের উপস্থিতি ৬৫% + ১০% = ৭৫%।

সুতরাং মানুষকে যুগপুৎভাবে মাটি ও পানি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।[৩] কুরআনেও বলা হয়েছে মানুষকে কাদামাটি তথা মাটি ও পানির সংমিশ্রনে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে মানুষের সৃষ্টির এ উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যেমন—

(ক) মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ ‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন’ *(আর-রূম, ৩০/২০)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন,﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ‘যিনি তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন’ *(আস-সাজদাহ, ৩২/৭)*।

(খ) মানুষকে পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ ‘আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে’ *(আর-রহমান, ৫৫/১৪)*।

(গ) মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ‘আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১২)*।

(ঘ) মানুষকে শুকনো কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ ‘আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি’ *(আল-হিজর, ১৫/২৬)*।

(ঙ) মানুষকে আঠালো মাটিতে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা মানুষকে আঠালো মাটিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ ‘আমিই তাদেরকে আঠালো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি’ *(আছ-ছাফফাত, ৩৭/১১)*।

(চ) মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ ‘তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৫৪)*।

---

* ফরক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।

১.

২.

৩.

পুরুষের বীর্য এবং নারীর ডিম্বাণু গঠিত হওয়ার উপাদান মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখান থেকে আসে। মোট কথা, পুরুষের বীর্য এবং নারীর ডিম্বাণু গঠিত ও বিকশিত হয় এমন কিছু কোষের মাধ্যমে, যা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝে উদগত। সুতরাং এই আয়াতটি সম্পূর্ণরূপে একটি অলৌকিক বিষয়, যখন এটি বলছে যে, বীর্য মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখান থেকে উদগত হয়'।[৪] অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে ভ্রূণের অণ্ডকোষের বীচি অণ্ডকোষের থলে নেমে আসে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অণ্ডকোষের বীচি নিচে নেমে আসে না, তখন এটাকে (কে নামক সার্জিক্যাল পক্রিয়ায় নিচে নামিয়ে আনা হয়।[৫]

(ছ) মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্য থেকে নির্গত তরল থেকে মানুষের সৃষ্টি : আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ - يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ 'অতএব, মানুষ যেন লক্ষ্য করে, কী থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্য থেকে' *(আত্ব-ত্বারেক, ৮৬/৫-৭)*।

অনেকেই ভাবতে পারেন যে, মানুষের বীর্য তো অণ্ডকোষের বীচি থেকে উৎগত হয়, তাহলে কুরআনে কীভাবে বলা হলো যে, তা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখান থেকে বীর্য উৎগত হয়?

এই প্রশ্নের জবাবে ড. মুহাম্মাদ আলী আল-বার্র বলেন, 'অণ্ডকোষের বীচি ও ডিম্বাশয় ঠিক এই অঞ্চল অর্থাৎ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখানে গঠিত। তারপর অণ্ডকোষের বীচি ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে আসে, এমনকি গর্ভধারণের সপ্তম মাসের শেষের দিকে শেষ পর্যন্ত তা তলপেটের বাইরে অণ্ডকোষের থলেতে এসে পৌঁছে। আর মেয়েদের ডিম্বাশয় নিম্ন ঔদরিক খাঁজে নেমে আসে।...

যাহোক, এদের পুষ্টি সঞ্চরণশীল, স্নায়ুবিক ও লসিকানালীর সিস্টেমে, যেখানে এদের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখান থেকে অণ্ডকোষের বীচি ও ডিম্বাশয়ে আসা অব্যাহত থাকে। অণ্ডকোষের বীচি ও ডিম্বাশয়ের ধমনি মহাধমনি থেকে উদগত যা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝে বিদ্যমান। অণ্ডকোষের বীচির শিরাগুলোও ঐ একই এলাকা তথা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝে গিয়ে শেষ হয়েছে। অণ্ডকোষের বীচি ও ডিম্বাশয়ের নার্ভগুলো একদল নার্ভ থেকে উদগত, যেগুলো মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝে পাকস্থলিতে অবস্থিত। রসবাহী ভেসেলগুলো ঐ একই এলাকা তথা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এসবের পরও কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে যে, মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখান থেকে অণ্ডকোষের বীচি ও ডিম্বাশয় পুষ্টি ও রক্ত গ্রহণ করে, এগুলো এমন কিছু নার্ভ থেকে গঠিত, যা ঐ স্থান থেকে উদগত?

(জ) মানুষকে নুতফাহ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একবার বীর্যপাতে গড়ে ৩.৭ মিলিলিটার বীর্য নির্গত হয়। আর প্রতি মিলিলিটার বীর্যে গড়ে ১০০ মিলিয়ন তথা ১০ কোটি শুক্রাণু থাকে। সুতরাং ৩.৭ মিলিলিটার বীর্যে ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ শুক্রাণু থাকে। আর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য একটি শুক্রাণুই যথেষ্ট।

আল-কুরআনে মানুষ সৃষ্টির এ অতি অল্প পরিমাণ শুক্রাণুর প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য নুতফাহ তথা অতি সামান্য পরিমাণ তরল বীর্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ 'তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন' *(আন-নাহল, ১৬/৪)*। এছাড়া আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরাতে একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বিষয়টি আরও আলোচিত হয়েছে আল-কাহফ, ১৮/৩৭; আল-হজ্জ, ২২/৫; আল-মুমিনূন, ২৩/১৩; ফাত্বির, ৩৫/১১; ইয়াসীন, ৩৬/৭৭; হা-মীম আস-সাজদাহ, ৪০/৬৭; আন-নাজম, ৫৩/৪৬; আদ-দাহর, ৭৬/২; আবাসা, ৮০/১৯ প্রভৃতি আয়াতে।

(ঝ) মানুষকে 'নুতফাতুন আমশাজ' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল-কুরআনে মানুষের সৃষ্টিশৈলী বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে' *(আদ-দাহর, ৭৬/২)*। এই আয়াতের ﴿نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ অর্থ হলো, মিশ্রিত তরল পদার্থ। আল-কুরআনের তাফসীরকারকদের মতে, এখানে মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ থেকে নিঃসৃত তরলের মিশ্রণকে বোঝানো হয়েছে। নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিশ্রিত হওয়ার পরও ভ্রূণ নুতফাহ আকারে অবস্থান করে। মিশ্রিত তরল পদার্থ দ্বারা শুক্রাণু জাতীয় তরল পদার্থকেও বোঝানো হতে পারে, যা বিভিন্ন লালাগ্রন্থির নিঃসরিত রস থেকে তৈরি হয়ে থাকে। এ হিসেবে ﴿نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ দ্বারা বুঝায় নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু, শুক্রাণু এবং এগুলোর চারপাশের তরল পদার্থের কিছু অংশ।

(ঞ) মানুষকে 'সুলালাহ' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে : মানুষের জন্মপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ 'অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে' *(আস-সাজদাহ, ৩২/৮)*।

আরবী শব্দ 'সুলালা'র তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর অর্থ- তরলের সাধারণ নির্যাস, স্বল্প পরিমাণ তরল ও একটি মৎস্যসদৃশ কাঠামো। উল্লেখ্য, মানুষের শুক্রাণু একটি লম্বা আকৃতির মাছের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। অধিকন্তু প্রত্যেক বীর্যপাতের সময় ৩০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন শুক্রাণু নির্গত হয়, যা থেকে কেবল ২০০টি শুক্রাণু ৫ মিনিটের মধ্যে নিষিক্তকরণ অঞ্চলে পৌঁছে যায়। সেসব থেকে কেবল একটি শুক্রাণুকেই ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্তকরণের জন্য নিংড়ে নেওয়া হয়। অধিকন্তু শুক্রাণুগুলো সামান্য পরিমাণ তরলের রূপ

৪. খালকুল ইনসান বায়না আত-তিব্বী ওয়াল কুরআন, পৃ. ১১৪-১২৪।
৫.

ধারণ করে, যা ৩.৫ থেকে ৫ মিলিমিটারের বেশি নয়। অতএব, এই কারণে কুরআনের 'সুলালা' শব্দটি কেবল যথার্থ বর্ণনাই প্রদান করে না, বরং এই উপধাপের অঙ্গসংস্থান এবং শরীরতাত্ত্বিক গঠনকেও নির্দেশ করে। আরো উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদ এই ধাপে কেবল পুরুষের বীর্য সম্পর্কে নির্দেশ করে। আর সেটা ভ্রূণবিদ্যার সাম্প্রতিক জ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

বিস্ময়কর মানবদেহের উপাদান : মানব শরীর সত্যি বিস্ময়কর। এটি একটি অভূতপূর্ব মেশিন। এই আশ্চর্য মেশিনটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক দিয়ে, যার নাম চামড়া। এর উপরিভাগে আবার রয়েছে ১ কোটি লোমকূপ।

প্রতিদিন মানুষের দেহের চামড়া থেকে ঝরে পড়ে অসংখ্য মৃত ত্বক-কোষ। হিসেব করে দেখা গেছে, মানুষের শরীর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৬ লক্ষ ত্বক-কোষ ঝরে পড়ে। এক বছরে এই ঝরে পড়া ত্বক কোষের ওযন দাঁড়ায় প্রায় ১.৫ পাউন্ড।[৬]

মানবদেহকে সচল রাখার জন্য যে পরিমাণ ফসফরাস আল্লাহ দিয়েছেন তা দিয়ে ২২০০ দিয়াশলাই বানানো যাবে। শরীরে পানি আছে ১০ গ্যালন। যে পরিমাণ কার্বন আছে (দেহের মোট ওযনের ১৮.৫%) তা দিয়ে ৯০০০টি পেন্সিলের নিব তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ লোহা (২-৬ গ্রাম) আছে তা দিয়ে বড় ধরনের ২ ইঞ্চি পেরেক তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ বিদ্যুৎ (১০০ ওয়াট) আছে তা দিয়ে ২৫ ওয়াটের একটি বাল্বকে অন্তত পাঁচ (৪ মিনিট) মিনিট সময় জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব। এই মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে পরিমাণ বাতাস (মিনিটে ৮ লিটার, দিনে ১১ হাজার লিটার এবং সারা জীবন ৩০ কোটি লিটার বাতাস) ব্যবহার করে, তা দিয়ে ৩৫ লক্ষ বেলুন ফোলানো যাবে। একজন ৭০ কেজি ওযনের মানুষের শরীরে ১৪০ গ্রাম সালফার বা গন্ধক থাকে। মানুষের শরীরে লবণ আছে প্রায় ২৫০ গ্রাম, রক্ত আছে প্রায় ১.৫ গ্যালন বা ৫ কেজি আর হাড় আছে শিশু বয়সে ৩০০টি, কিন্তু বয়স বাড়লে তা কমে দাঁড়ায় ২০৬ টিতে।

প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে ৮৬ বিলিয়ন নার্ভ সেল আছে। প্রতিটি আদম সন্তানকে ৩৬০ গিরা বা জোড়ের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭] এ গিরা না থাকলে কোনো দিকে বাঁকানো যেত না। একজন মানুষের দেহে চামড়া রয়েছে ২ বর্গমিটার বা ২২ বর্গফুট।[৮] আমাদের শরীরে মোট ৩৭.২ ট্রিলিয়ন কোষ আছে। শিশুদের যে পরিমাণ কোষ আছে, তা পাশাপাশি জোড়া লাগালে ৬০ হাজার মাইল হবে, আর প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কোষ পাশাপাশি জোড়া লাগালে তা ১ লাখ মাইল হবে।[৯] একজন মানুষের শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য যে শিরা আছে, তার সবগুলোকে পাশাপাশি সাজালে দেড় একর জমির প্রয়োজন হবে। মানবদেহে প্রতিদিন ২০০ বিলিয়ন নতুন রক্তকণিকা উৎপন্ন হচ্ছে।

একটি কম্পিউটার খুললে আমরা দেখতে পাই, অসংখ্য ক্যাবল সংযোজন করে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনি মানবদেহের মস্তিষ্কের সাথে সংযোজিত রয়েছে, শিরা, উপশিরা, ধমনি, স্নায়ু ইত্যাদির বহুরূপী অসংখ্য ক্যাবল। যার ফলে আমরা যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে পারি। এখন প্রশ্ন হলো, মানবদেহের এই অসংখ্য শিরা, উপশিরা, ধমনি, স্নায়ু ইত্যাদি এত সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুনিপুণভাবে সংযোজন করলেন কে? একটি কম্পিউটারের যদি একজন আবিষ্কারক থেকে থাকেন, তবে মানবদেহের মতো এত নিখুঁত, নির্ভুল ও নিপুণ কম্পিউটারের কোনোই কি সৃষ্টিকর্তা নেই, এটি কোন যুক্তিতে টেকে?

মানুষের চোয়াল এতই শক্তিশালী যে, প্রতিবারে ২৭৯ পাউন্ড বা ১২৫ কেজি ওযন বলপ্রয়োগ করতে পারে। হাড়গুলো স্টিলের চেয়েও শক্ত। আমাদের রুচিবোধের জন্য অর্থাৎ কোনটা আমরা পছন্দ করি, কোনটা আমরা অপছন্দ করি এটি বলে দেওয়ার জন্য রয়েছে ৯০০০ ছোট সেল, যেগুলোকে যথারীতি সাহায্য করার জন্য রয়েছে আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ নার্ভ সেল। মানুষের মস্তিষ্ক ১০ ওয়াটের বাল্ব এর সমান শক্তি প্রয়োগ করে। মানুষের ফুসফুস থেকে বের হওয়া বায়ুর তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং হাতের ছালের তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মানবদেহে আল্লাহ তাআলা যে কত কিছু দান করেছেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গেলে বিশালাকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন' *(আল-ইনফিত্বার, ৮২/৭)*।

যিনি দয়া করে, অনুগ্রহ করে মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন, এই পৃথিবীতে সে যেন জীবন ধারণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করেছেন, যাবতীয় ব্যবস্থা যিনি করে যাচ্ছেন, তাঁর দাসত্ব না করে মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করছে। আল্লাহর বিধানের বিপরীত পন্থায় যাবতীয় কাজকর্ম করে যাচ্ছে। একটি বারের জন্যও চিন্তা করছে না যিনি তাকে শূন্য থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, প্রতি মুহূর্তে তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত করছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে, কোন সে বিজ্ঞানী যিনি মায়ের গর্ভে গভীর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শুক্রাণু থেকে এরূপ বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যে ভরা মানুষ সৃষ্টি করলেন? কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনিই হচ্ছেন সুমহান আল্লাহ।

---

৬. ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৭।
৮. ও ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।
৯. টাইমস অব ইন্ডিয়া।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব

*[৩০ ছফর, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বুয়াইজান** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।** খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। যিনি পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আত্মীয়তা ও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আর যিনি আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখাকে আবশ্যক করেছেন এবং এর জন্য বড় প্রতিদান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি মানুষের মাঝে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর। এছাড়া তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী ও তাঁর সমস্ত অনুরাগীদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর আনুগত্যের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর সন্তুষ্টিকে নিশ্চিত করে। তিনি তাদেরকে তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন যা তাঁর ক্রোধকে অবধারিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ 'অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা সে দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে' *(আল-যিলযাল, ৯৯/৭-৮)*। অতএব, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চলুন। আর আপনার জীবনকে আমলের মাধ্যমে যাপন করুন এবং কর্মের মাধ্যমে আপনার কথার হক্ব আদায় করুন। কেননা মানুষের জীবনের যে অংশটুকু আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত হয়েছে তাই হলো আসল। বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজেকে আল্লাহর জন্য সঁপে দেয় এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর সে ব্যক্তি হতভাগা যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়।

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো হক্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করা। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর নিকটে উক্ত হক্বসমূহের মধ্যে অন্যতম পালনীয় হক্ব হলো নিকটাত্মীয়ের হক্ব। আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে নিকটাত্মীয়ের হক্ব আদায় করা এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 'অতএব আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক্ব দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এটি উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম' *(আর-রূম, ৩০/৩৮)*। এখানে আল্লাহ তাআলা নিকটাত্মীয়দের অধিকার সাব্যস্ত করেছেন এবং তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের অধিকারকে স্বীয় তাওহীদ বা একত্বের সাথে উল্লেখ করে বলেন, ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ 'তোমরা ইবাদাত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতাপিতার সাথে, নিকটাত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহংকারী' *(আন-নিসা, ৪/৩৬)*। কাজেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা একটি বড় হক্ব ও কর্তব্য এবং এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল ও সৎকর্ম।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আত্মীয়তার বন্ধন মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও আনুগত্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রশান্তি তৈরি করে এবং ঘৃণা, বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতাকে ধ্বংস করে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি এই মর্মে পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ 'আর স্মরণ করো, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না এবং সদাচরণ করবে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বলো, ছালাত ক্বায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে

মুখ ফিরিয়ে নিলে' *(আল-বাক্বারা, ২/৮৩)*।

হে মানুষসকল! আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসের অন্যতম দাবি ও আবশ্যকীয় বিষয়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার রক্তের সম্পর্ককে অটুট রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে'।[১]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা জীবিকা বৃদ্ধি, অর্থসম্পদে বরকত, দীর্ঘায়ু লাভের অন্যতম কারণ। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করে'।[২]

হে মুসলিমগণ! আত্মীয়তার সম্পর্ক এমন অধিকার যা আল্লাহ অবধারিত করে দিয়েছেন, এটা এমন ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আপনাদেরকে খুব শীঘ্রই এ সম্পর্কে আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হতে হবে; কাজেই রক্তের সম্পর্ক ও স্বজনদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করুন।

যারা আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আপনি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন, যারা আপনাকে বঞ্চিত করেছে আপনি তাদের প্রদান করুন, যারা আপনার সাথে অন্যায় করেছে আপনি তাদের ক্ষমা করুন। সর্বক্ষেত্রে ইহসান করুন; নিশ্চয় আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন। অতঃপর জেনে রাখুন! আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা বিনিময়ের মাধ্যমে হয় না, বরং ছওয়াবের প্রত্যাশা ও দ্রুত সম্পন্নকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার আত্মীয়স্বজন আছেন। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি; কিন্তু তারা আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করে থাকি, কিন্তু তারা আমার অপকার করে। আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে থাকি আর তারা আমার সঙ্গে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে। তখন তিনি বললেন, 'তুমি যা বললে, তাহলে যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয় তুমি যেন তাদের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করছ। আর সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবে, যতক্ষণ তুমি এ অবস্থায় বহাল থাকবে'।[৩]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সর্বোত্তম কাজ হলো নিকটাত্মীয় শত্রুর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে নিজের নফসের সাথে লড়াই করা। কেননা এতে তা নফসের বিভিন্ন অনুসঙ্গ (হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি) দ্বারা কলুষিত হয় না। হাকিম ইবনু হিযাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, ছাদাক্বাসমূহের মাঝে কোন ছাদাক্বাটি উত্তম? তিনি বললেন, عَلَى ذِى الرَّحِمِ الكَاشِحِ 'সম্পর্ক ছিন্নকারী বা শত্রুতা পোষণকারী নিকটাত্মীয়দের প্রদানকৃত ছাদাক্বা'।[৪]

জনৈক কবি বলেন, (ভাবার্থ) 'ওহে স্বজাতির সন্তানেরা! শত্রুতার কুফল হলো, বিদ্বেষ যা স্বজনের হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে। কত মানুষ রয়েছে যার উপকারিতা দূরের লোকেরা পায়, অথচ তার নিকটাত্মীয়রা আজীবন বঞ্চিত থাকে। এটা কল্যাণকর জীবন নয় যে, তার জীবিকা থেকে পরিবার উপকৃত হয় না, তার মৃত্যুতে নিকটজনও হা-হুতাশ করে না'।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকে তাদের প্রতি আন্তরিকতা দেখানো, তাদের প্রতি খরচ করা বা দান করা এবং তাদের প্রতি ইহসান প্রদর্শন ও তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের মাধ্যমে। এছাড়া তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের পাশে থাকা কর্তব্য, যা আত্মীয়তার বন্ধনকে শক্তিশালী করে, ভালোবাসার রশিকে সুদৃঢ় করে এবং হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। এ সম্পর্ক রক্ষা হয় পরস্পর শুভকামনা জ্ঞাপন, সহযোগিতা, পরোপকার এবং ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে একে অপরকে ভালো কথা বলা, হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেওয়া এবং অন্যান্য ভালো কাজ দ্বারাও আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৩৮।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৭।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৮।
৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৩৫৫।

আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক' *(আন-নিসা, ৪/১)*।

بارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه...

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের উপর ইহসান করেছেন। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর। তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী ও তাঁর সমস্ত অনুরাগীদের উপর অগণিত দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক।

হে মানবসকল! আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ 'তবে কি তোমরা প্রত্যাশা করছ যে, যদি তোমরা শাসন কর্তৃত্ব পাও, তবে তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, ফলে তাদেরকে বধির ও তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/২২-২৩)*।

কাজেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা পাপ এবং মহা অপরাধ, যা আল্লাহর লা'নত ও শাস্তিকে অবধারিত করে। এটা এমন যুলম যা হৃদয়কে নিঃসঙ্গতা, ঘৃণা ও কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেয়। আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার যে বন্ধনকে অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করার চেয়ে বড় যুলম আর কী হতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ 'আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যই লা'নত আর তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের মন্দ আবাস' *(আর-রা'দ, ১৩/২৫)*।

হে মানবসকল! রক্তসম্পর্ক আল্লাহর রহমতের একটি নিদর্শন যা তাঁর রহমতের সাথে জড়িত। কাজেই যে তা ছিন্ন করল সে যেন আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, আর যে তা রক্ষা করল আল্লাহর রহমত যেন তাকে ছেয়ে নিল। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করলেন। তারপর যখন তিনি এর থেকে অবসর হলেন, তখন রহীম (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি থামো। আত্মীয়তার বন্ধন তখন বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে আশ্রয় চাওয়ার জায়গা এটা। এতে আল্লাহ ঘোষণা করলেন, তুমি কি এতে রাযী নও যে, যে লোক তোমার সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে আমিও তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখব আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব? সে বলল, আমি এতে সন্তুষ্ট, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, তা-ই তোমার জন্য'।[৫]

হে মানুষসকল! আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা জীবনের স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করে আর সম্পর্কচ্ছেদ জীবনে বিনাশ ডেকে আনে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা প্রতিদান ও ছওয়াবের কাজ, পক্ষান্তরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যুবায়ের ইবনু মুতইম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬] আবূ বাকরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যেসব পাপীকে পার্থিব জগতেই তার পাপের ত্বরিত শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন, তা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও রাষ্ট্রদ্রোহীর পাপ'।[৭]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। রবের সামনে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়ার আগে নিজেদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনুন। মৃত্যুর আগেই আপনার ঋণ পরিশোধ করুন। রক্তের সম্পর্ককে ঠিক করুন। একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রতিদানের আশা করুন। মৃত্যুর আগেই আত্মীয়তার ছিন্ন সম্পর্ককে ঠিক করে নিন। যারা আপনার উপর যুলম করেছে তাদের ক্ষমা করুন, কারণ এটি আপনার দুনিয়ার জীবনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ 'আর সৎকর্ম করো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৫)*।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সম্মানিত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীন, কিতাব ও আপনার প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা বেশি বেশি মহান আল্লাহকে স্মরণ করুন, তিনি আপনাদের স্মরণ করবেন। আপনারা তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া করুন, তিনি আরো বৃদ্ধি করে দিবেন।

---

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫০২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৪।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৬।
৭. আহমাদ, হা/২০৩৯৮; তিরমিযী, হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ, হা/৪২১১, হাদীছ ছহীহ।

তারা কেন নাস্তিক?

-সাঈদুর রহমান*

অনেক মুসলিমের মনেই একটা প্রশ্ন জটলা বেঁধে আছে, ‘কেন মানুষ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামবিদ্বেষী হয়?’ ‘দু’চোখ দিয়ে ইসলামকে দেখতে পারে না। ইসলামের নাম শুনলেই নাক সিটকায়, মেনে নিতে পারে না ইসলামকে। তারা কী এমন ধূম্রজালে আটকে আছে, যার ফলে তারা ধর্মবিমুখ? বিষয়টি যদি এমন হতো যে, তারা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা মূর্খ, তাহলে মেনে নেওয়া যেত। তারা তো বড় বড় ডিগ্রিধারী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। সমাজের লোক তাদের কথায় উঠে বসে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের রয়েছে যথেষ্ট প্রভাব। জ্ঞানের বিভা ছড়াচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে। তারাই বর্তমানে রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তারা কেন বুঝতে চায় না যে, ইসলাম একটি কল্যাণমুখী, মানববান্ধব ও শাশ্বত ধর্ম। আপনাদের এই কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রশ্নের গায়ে মধ্যাহ্নের দীপ্তিময় সূর্যের পরশ বুলিয়ে দিব। নিমিষেই দূর হয়ে যাবে ধোঁয়ার আবছায়া। এখানে একটা কথা বলে রাখি, তারা নিজেদের নাস্তিক দাবি করে। আদতে তারা স্রেফ নাস্তিক নয়; বরং ইসলামবিদ্বেষী। তাদের তো দেখা যায় না ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের সমালোচনা করতে। যত বিষোদগারের তির ছোড়ে ইসলামের গায়ে।

এবার শুরু করি আসল কথা। ইসলামবিদ্বেষী হওয়ার কিছু কারণ আমি রপ্ত করেছি। যা আপনাদের সমীপে উল্লেখ করছি।

(১) প্রবৃত্তিপূজা : প্রবৃত্তিপূজা মানে মনে যা চায় তাই করা। মনে যা চায় তা করতে গেলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ দেখা দিবে। উদাহরণ টেনে একটু বুঝাই। ধরুন, আপনার মন চাচ্ছে আপনার পাশের বাড়ির এক মেয়ের সাথে ব্যভিচার করার। এখন আপনি যদি জোর করে আপনার কামবাসনা চরিতার্থ করতে পা বাড়ান, তাহলে কি ওই মেয়ের বাবা-মা, ভাই, আত্মীয়স্বজন আপনাকে ছেড়ে দিবে? কিছুই বলবে না তারা? অবশ্যই না। বরং আপনাকে তারা গোটাটাই গিলে ফেলতে চাইবে। তাদের বোনের ইযযত নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলবেন, সেটা তারা কখনই মেনে নেবে না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে প্রবৃত্তিপূজারি হয়ে চলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ ‘যদি হক্ব তাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হতো, তাহলে আসমান-যমীন ও এদুয়ের মাঝে যা আছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৭১)*।

আপনি যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন অধিকাংশ ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক চরিত্রহীন, প্রবৃত্তিপূজারি। আর ইসলাম হলো তাদের কুপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক। তারা চায় যত্রতত্র খোলামেলা নারীদের নিয়ে ঘোরাফেরা করতে, মদ খেতে, রাতভর নারী নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিতে মেতে উঠতে, যা ইচ্ছে তাই খেতে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলতে। হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা না করতে। যত প্রকার অশ্লীলতা বেহায়াপনা আছে সবই করতে। কিন্তু ইসলাম হলো তাদের এ কাজের প্রতিবন্ধক। এজন্য তারা ইসলামকে মেনে নিতে পারে না, ইসলামের সমালোচনায় অষ্টমুখ হয়ে ওঠে। তাদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে একমাত্র ইসলাম। আপনি যদি ইউটিউবে এ কথা লিখে সার্চ দেন যে ‘বাংলাদেশের ১০ জন নিকৃষ্ট নাস্তিকের’ নাম, তাহলে দেখবেন চলে এসেছে বিখ্যাত কিছু নাস্তিক। একজনের হাতে দেখতে পাবেন মদের বোতল, আরেক নারী পরে আছে গেঞ্জি। তাদের এমন এমন কুরুচিপূর্ণ কথা আছে, যা কখনো স্বাভাবিক মানুষ থেকে কল্পনা করা যায় না। তারা চায় নারী-পুরুষ একাকার হয়ে চলুক। সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া যে যেভাবে পারুক উপার্জন করুক, তাতে কোনো আসে যায় না। তাদের এ মতের বাধাদানকারী হলো ইসলাম। এজন্যই তারা ইসলামকে নিয়ে সরগরম করে।

(২) কুসংস্কার বা অধর্মকে ধর্মীয় রীতি মনে করা : একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষিত ব্যক্তির ভালো-মন্দ ঠাহর করার ক্ষমতা রয়েছে। কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় সব সে বুঝে। কোনটা বিবেকবিরোধী আর কোনটা বিবেকের সাথে যায় অনুধাবন করতে পারে। জাতির মশালধারী এই ব্যক্তি যখন দেখতে পায়, কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের আশায় তারই মতন একজন রক্তমাংসে গড়া মানুষের পায়ে সিজদা করছে, হরেক রকম উপহার উপঢৌকন দিচ্ছে, কুরবানী করছে তাদের নামে, তখন তাদের বিবেকের দ্বারে স্বভাবতই কড়া নাড়ে। এটা কীভাবে সম্ভব? মানুষ হয়ে একজন তারই মতন মানুষের পায়ে সিজদা করছে? যখন আরাধনায় ব্রতী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আপনি আপনার

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

মতনই একজন মানুষের পায়ে সিজদা করলেন, এর হেতু কী?' ওই মূর্খ মুরীদ লা জওয়াব হয়ে শুধু এতোটুকু বলে, এটাই ইবাদত, আরাধনা। আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন তাদের চরণে সিজদা করতে, তাদের সম্মান করতে, তাদের সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি। সরলমনা শিক্ষিত ব্যক্তির মন এই মূর্খতাসুলভ উত্তরে তুষ্ট হতে পারে না। কোনোভাবেই বিবেক প্রবোধ পায় না। পরিশেষে ব্যক্তি মনে করে ধর্ম মানেই এমন অন্ধবিশ্বাস। যার মাঝে যৌক্তিকতার লেশমাত্র নেই। ধর্ম হলো আফিমের মতো। একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন নেশাচ্ছলে অন্ধের মতো কত কিছুই না করে, অনুরূপ ধার্মিক ব্যক্তিরাও যৌক্তিকতাহীন মনগড়া কত কিছুই করে থাকে। এই তরুণ মনে করে এগুলো আন্দাজনির্ভর, ফালতু কাজকর্ম। এই ভদ্রলোকটিকে কে বুঝাবে, যে কাজগুলো সে প্রত্যক্ষ করেছে, এগুলো আদতে ইবাদত নয়; বরং শিরকী কর্মকাণ্ড। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অসংখ্য স্থানে এসব শিরকী কাজ নিষেধ করেছেন। হিন্দুদের থেকে অনুপ্রবেশ করেছে এসব রীতি। এই লোকটি এখানে অধর্মকে ধর্ম মনে করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে কিছু ভণ্ডলোকের কারণে। সে ইসলামের প্রকৃত রূপ থেকে বহু দূরে রয়ে গেল। জানতে পারল না ইসলাম এগুলো সমর্থন করে না। সে জেনেছে, তবে ভুল জেনেছে। তার বিবেকই আদতে সঠিক তথ্য দিয়েছে। এগুলো কখনোই ধর্ম হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর বলেছেন, ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ 'যে আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। আর তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যালেমদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী' *(আল-মায়েদা, ৫/৭২)*।

আরও একটু অগ্রসর হই। মাস্টার্স কমপ্লিট করা এক তরুণ গুলিস্তানের মোড়ে দেখতে পেলো, ইয়া বড় এক দাড়িওয়ালা লোক বসে ঝিমুচ্ছে! বেশভূষা উন্মদ সদৃশ। মুখ ঝাপটে আছে ঘনকালো মোচে। গলায় ঝুলছে বড় তালা। তাকে নাকি বলা হয় 'তালাবাবা'! চুলগুলো উশকোখুশকো ধুলোবালিতে পালিশ করা। মলিন চেহারা, যেন কয়েক শতাব্দী ধরে গোসল করে না। একজন লোককে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করল তরুণটি। প্রত্যুত্তরে বলা হলো, 'এটা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ওরা সদা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। নেই তাদের পার্থিব মোহ'। এই তরুণ এখন কী মনে করবে? মনে করবে, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা! এত অপরিচ্ছন্ন! মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসছে বায়ুর চরকায় চড়ে! আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এমন হয়! না, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যাবে না। স্মার্ট হতে হবে আমাকে। এমন পাগলের মতো হলে চলবে না। বলুন তো, এই লোকটি কী শিখল? অধর্ম শিখেছে। ধর্মের শিক্ষা হলো, 'আল্লাহ সুন্দর আর তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন'।[১]

ইসলামের নবী ﷺ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অর্ধেক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২] ইসলাম ধর্মের নবী ﷺ সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কত কিছু ব্যবহার করতেন! তিনি নিয়মিত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, কেশগুচ্ছ তেল দিয়ে পরিপাটি করে রাখতেন, চোখে সুরমা দিতেন, প্রতিদিন কয়েকবার দাঁত পরিষ্কার করতেন। এগুলো হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও রূপরেখা। এই শিক্ষাগুলো যদি আমাদের আধুনিক সোসাইটির তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রচার করা যেত!

একজন আধুনিক শিক্ষিত তরুণ রাস্তা দিয়ে মধ্যরাতে হাঁটছে। আকাশের চাঁদ মধ্যগগন থেকে আলো ছড়াচ্ছে ঘুমন্ত বিশ্ববাসীর প্রতি। আলোর বিকিরণে তার ছায়া ঢের বড়সড় হয়েছে। তরুণটি আচমকা মাইকের শব্দ শুনতে পেল! তার হৃদয়ে একটু ধাক্কা দিল। এত রাতে কী হচ্ছে সেখানে? কৌতূহলবশত মাইকের শব্দের উৎস খুঁজতে লাগল। কোত্থেকে আসছে এই গগণবিদারী শব্দ। অনুমান করে সামনে এগোচ্ছে সে। দেখতে পেল বিশাল সামিয়ানা! সারা মাঠ কানায় কানায় ভর্তি। লোকে লোকারণ্য। একজন বক্তা এই ভরা মজলিসে 'ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ' যিকির করছে আর উপস্থিত শ্রোতারাও তার সাথে সুর মিলিয়ে যিকির করছে। অনেকে তো পাগলের মতো ঝাঁকড়া চুল নাড়াচ্ছে। কেউ কেউ দৌড় দিয়ে বক্তার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। তরুণটি গভীরভাবে পরিবেশটা অবলোকন করছে। এ কী! মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে কেউ কেউ! কেউ কেউ তো অবচেতন মনে বাঁশের খুঁটির ওপর উঠে লাফালাফি করছে। এ তো এক পাগলের মেলা। বিকারগ্রস্ত লোকদের সমাগম। শিক্ষিত তরুণটি ভাবনায় আত্মানিয়োগ করল। একটা ধর্ম কি এমন হতে পারে? ধর্ম তো এমন হওয়ার কথা নয়। ধর্ম মানুষকে উত্তম বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দিবে, সভ্য সুশৃঙ্খল পরিবেশ উপহার দিবে। তারা এমন উন্মাদের মতো আচরণ করছে কেন? চ্যাঁচামেচি করছে কেন নির্বোধের মতো? না, এমন হওয়া যাবে না। ধর্ম মানেই হলো ভণ্ডামি, হঠকারিতা! আল্লাহ বলতে কিছু নেই! আল্লাহ যদি থাকতেন, তাহলে এমন আচরণের আদেশ দিতে পারতেন না! সব হুজুরদের মনগড়া কাজ! ধর্ম বলতে পৃথিবীতে আদৌ কিছু নেই! এক শ্রেণির

১. সিলসিলা ছহীহা, ৪/১৬৬।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/৪২২।

মানুষ ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে, ধোঁকা দিচ্ছে, আর নিজের পকেটপূর্তি করছে অন্যের অজস্র টাকা-পয়সা দিয়ে। সরলমনা পাবলিক তাদের প্রবঞ্চনায় প্রলুব্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রিয় ভাই, এই তরুণটির ধারণা এমন হলো কেন? কেন সে ইসলাম সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করছে? সঠিক ইসলামের দাওয়াত পেলে এমন হতো? কক্ষনো না। ইসলামী শিক্ষা হলো, ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ ‘তুমি তোমার প্রতিপালককে অনুচ্চ আওয়াজে, মনে মনে সঙ্গোপনে সবিনয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করো। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/২০৫)*।

ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ﷺ খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রস্থান করছেন। মনে প্রশান্তি বিরাজ করছে। আল্লাহর অবারিত নেয়ামতের বারি বর্ষিত হয়েছে মুসলিমদের ওপর। শত্রুদের শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করেছে মুসলিম সেনানীরা। ছাহাবীগণের মনেও প্রশান্তির হিল্লোল বইছে। উৎফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তারা মহান রবের মহিমা বর্ণনা করছেন একটু জোরেশোরে। তাদের যিকিরের গুঞ্জন রাসূল ﷺ-এর কর্ণকুহরে অনুরণিত হলো, তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ ‘হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী’।[৩]

এই তরুণ যুবকটি ইসলামের প্রকৃত রূপ জানতে পারল না ভণ্ড কিছু ধর্মব্যবসায়ীর কারণে। এই যুবকটি আজ ধর্মব্যবসায়ীদের কারণে সঠিক ইসলাম জানতে পারল না। যার ফলে সে ইসলাম থেকে বহু দূরে অবস্থান করল। ইসলামী বিধানকে মনে করছে সেকেলে। বস্তুবাদী মূলনীতি ও শিক্ষাকে মনে করছে মানবতার মুক্তির মূলমন্ত্র। এর দায়ভার কে নিবে? হে ভণ্ড হুজুর! পরকালে কী জবাব দিবে মহান প্রতিপালকের দরবারে? কিছু তরুণ-তরুণী ইসলামবিমুখ হচ্ছে ভুয়া কুসংস্কারকে ইসলামী বিধান মনে করে, আর কিছু হচ্ছে প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে। নিজের মন যা চাচ্ছে তাই করছে।

পাঠককোণ থেকে বলছি, ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করবেন না। ইসলাম আপনার পক্ষের জিনিস, কল্যাণকামী। সদা চায় আপনার অন্তরে প্রশান্তির ফল্গুধারা বর্ষণ করতে। আপনি বিপদে পড়ুন এটা কখনো আল্লাহ তাআলা চান না। ইসলামী কিছু বই পড়ুন। অযথা অবহেলায় বেখেয়ালে তো ঢের সময় নষ্ট করেছেন। ইসলামের খাতিরে একটু সময় ব্যয় করুন। গবেষণার রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করুন। হৃদয়ের আবদ্ধ দুয়ার একটু উন্মোচন করুন। খুলে দিন বন্ধ বাতায়ন। ইসলামী সমীরণ হৃদয়ের সংকীর্ণ জটলাবাঁধা আস্তরণ মুছে দিবে। ইসলামকে নিয়ে এতো সমালোচনা করছেন! আপনি যে বুলি আওড়াচ্ছেন, তা কি ‘অরণ্যে রোদন’ নাকি যথার্থ একটু দেখুন। কারো ব্যাপারে সমালোচনা করতে হলে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয়; নচেৎ না জেনে কারো উপর মিথ্যা বুলি জুড়ে দেওয়া অন্যায় বৈ কিছু নয়। আপনি ইসলামের নবী ﷺ নিয়ে একটু পর্যালোচনা করুন। তাঁর জীবনী শীর্ষক গ্রন্থ ‘আর রাহীকুল মাখতূম’ সময় করে পড়ুন। তাঁর জীবনধারা, কর্মপদ্ধতি, সমাজ সংস্কার কীভাবে করেছেন একটু দেখুন। শুধু বস্তুবাদী ভোগবাদীদের ব্যঙ্গাত্মক রসাত্মক কথা শুনে হাসলে চলবে? অন্ধভাবে তাদের পিছনে ছুটলে চলবে? আপনার না বিবেক আছে? এক্ষেত্রে আপনার বিবেক অবরুদ্ধ কেন? আপনি তো বাহ্যিক প্রমাণপঞ্জিতে বিশ্বাসী। আপনাকে ভালোবেসে বলছি। একটু ইসলামের মোড়ানো পৃষ্ঠাগুলো ভাঁজ করুন। ঝরে পড়া ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন। আপনার জ্ঞানের সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ প্রশস্ত করুন ইসলামী জ্ঞানের জ্যোতি দিয়ে। একবার অবগাহন করুন ইসলামী দরিয়ায়। সন্দেহ-সংশয় ও বাতিলের আবর্জনা আপনার থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাবে। আসুন না একটু ইসলামের আশপাশে আসি। বদলে যাই, বদলে দেই। ইসলাম আপনাকে বুকে তুলে নিবে। মুছে দিবে আপনার পাপ-পঙ্কিলতা, আপনার অশান্ত বিষণ্ণ মনে গেঁথে দিবে শান্তির বাসন্তী হাওয়া। আপনার সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। জানি, আপনি সদা পার্থিব পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন; কিন্তু ভাই তারপরও একটু সময় বের করে ইসলামকে জানুন। দেখবেন আপনার লেখাপড়া আগের তুলনায় বহুগুণে উৎকর্ষিত হচ্ছে, কিছু একটা তৃপ্তি পাচ্ছেন। আপনি একবার পড়ে দেখুন না! মনে রাখবেন সৃষ্টিকুলকে হৃদয়ের গহীন থেকে ভালোবাসলেও ব্যর্থ ও কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু স্রষ্টাকে ভালোবাসলে আপনি সুখী হবেনই ইনশা-আল্লাহ। তিনি আপনার হৃদয়কে এক পশলা মৃদুঠাণ্ডা রহমত দিয়ে শান্ত করবেন। আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন- আমীন!

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯২।

দ্বীনী জ্ঞানার্জন থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ

-আহমাদুল্লাহ*

দ্বীনী জ্ঞান অর্জন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া রহমত। এই রহমত সবার ভাগ্যে হয় না। এই জ্ঞান অর্জন করতে হলে যেমন রহমত প্রয়োজন, তেমনি করতে হয় কঠোর পরিশ্রম। তবেই অর্জিত হয় দ্বীনী জ্ঞান। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'।[১]

এখানে জ্ঞান বলতে বুঝানো হচ্ছে দ্বীনী জ্ঞান। ফরয বলা হয় যা আল্লাহ কর্তৃক এসেছে। অর্থাৎ একজন মুসলিমকে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর এই জ্ঞান বেশি অর্জিত হয় আমাদের দেশের ক্বওমী প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করান। কিন্তু দেখা যায়, খুবই কম শিক্ষার্থী এই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এর কারণ কী? এর বেশ কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(১) সময়কে মূল্যায়ন না করা : শিক্ষার্থীরা সময়কে মূল্যায়ন করবে। কিছু ছাত্র সময়কে মূল্যায়ন না করে উল্টো সময়কে নষ্ট করে। যেমন— গল্প করা, খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি। সময় এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার দরুন আল্লাহ এই সময়ের কসম করে বলছেন, ﴿وَالْعَصْرِ﴾ 'সময়ের কসম' *(আল-আছর, ১০৩/১)*।

অতএব বুঝা যাচ্ছে সময় হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রত্যেক ছাত্রকে সময়ের মূল্যায়ন করা আবশ্যক। সময়কে কুরআন-হাদীছের পিছনে ব্যয় করতে হবে। তবেই অর্জন হবে দ্বীনী জ্ঞান। আর এই সময়কে রুটিন অনুযায়ী ভাগ করে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাবে তুমি সময়মতো সব পড়া শিখতে পারবে। তাই ছাত্র জীবনে সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে, অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না।

(২) স্মার্টফোন ব্যবহার : স্মার্টফোন শিক্ষার্থীদের মেধা নষ্টের একটি অন্যতম কারণ। শিক্ষার্থীদের কাছে এই ফোন থাকলে জ্ঞান অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই ফোন কাছে থাকলেই একটু ইচ্ছা করবে যে, একটু গেম খেলি বা ফেসবুক চালাই। চালাতে চালাতে দেখা যায় যে, তুমি কয়েক ঘণ্টা পার করে ফেলেছ। এর ফলে তোমার বহুসময় নষ্ট হয়ে যাবে, যা তোমার জীবনকে নষ্ট করে দিবে। শুধু তাই নয়, এই ফোন হচ্ছে যেনার নিকটবর্তী হওয়ার মূল কারণ। শিক্ষার্থীকে এই ফোন কতটা নিচে নিয়ে যেতে পারে! অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেছেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

তাহলে উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা এই যেনার পথ থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ যেনার নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে স্মার্টফোন। এটি মস্তিষ্ককে নষ্ট করে দেয়, যার ফলে বিদ্যা হারিয়ে যায়। এর আরেকটি মন্দ দিক হলো গান-বাজনা, যা শুনলে মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় চলে যায় এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। গান-বাজনা এটি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই গান-বাজনা থেকে নিষেধ করেছেন। কাজেই ছাত্রজীবনে স্মার্টফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩) অসৎ বন্ধু : এটিও জ্ঞান অর্জনে বাধা প্রদান করে। যেমন কথায় আছে সঙ্গদোষে লোহা ভাসে। লোহাকে যদি কাঠের সাথে বেঁধে ভাসানো হয়, হলে তা ভাসবে। তেমনি কোনো ভালো ছাত্র বা ছাত্রী অসৎ ছেলে-মেয়ের সাথে চললে সেই ভালো শিক্ষার্থীও খারাপ শিক্ষার্থীতে পরিণত হবে।

তোমার বন্ধু তোমাকে বলবে, চলো সিনেমা চলছে দেখে আসি। তুমি যেতে না চাইলেও তোমাকে জোর করে নিয়ে যাবে। আবার কখনো পার্কে নিয়ে যাবে। এভাবে দেখবে যে, তুমি ক্লাস থেকে ছুটি নিচ্ছ মিথ্যা কথা বলে। আর বন্ধুর সাথে ঘুরতে যাচ্ছ। এর ফলে দেখবে যে, তোমার রোল ছিল সবার আগে, এখন তোমার রোল আগে থাকা তো দূরের কথা ফেল করে বসে আছো। বন্ধু থাকবে, কিন্তু সেই বন্ধু হবে জ্ঞানী, যে তোমাকে তোমার পড়ায় সাহায্য করবে। কথায় আছে, একটি বই ১০০টি বন্ধুর সমান আবার একটি বন্ধু একটি লাইব্রেরির সমান। কাজেই এমন কাউকে বন্ধু বানাবে, যার কাছ থেকে কোনো খারাপ কিছু নয়, বরং জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। তাই অসৎ বন্ধু থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

* মা'হাদ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

(৪) অলসতা : শিক্ষাজীবনে পড়ালেখা থেকে বিরত থাকার একটি প্রধান কারণ হলো অলসতা। যেমন দেখা যায় যে, সপ্তাহে যখন বৃহস্পতিবার আসে, তখন মনে হয় যে, আজ না পড়ে কাল পড়ব। এরপর যখন শুক্রবার আসে, তখন দেখা যায় ফজর ছালাত পড়ে এসে ঘুমাই। উঠতে উঠতে ১০টা বাজে। এরপর খেয়ে গোসল করে আসতে আসতে সাড়ে ১১টা বাজে। এরপর এসে আবার একটু গল্প করে। তারপর দেখে যে, ১২টা বেজে গেছে। তখন তাড়াতাড়ি ওযূ করে মসজিদে যায়। এভাবেই শুক্রবার শেষ। এরপর শনিবারে আসলে দেখা যায় যে, আটটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিই মুখস্থ হয়নি। এই অলসতা কাটিয়ে উঠতে পারলে সফলতা অর্জন করতে পারবে। যেমন আরবী প্রবাদে আছে, مَنْ جَدَّ وَجَدَ 'যে চেষ্টা করে সে ফল পায়'। কাজেই যারা অলসতা ত্যাগ করতে পারবে, তারাই সফলতা অর্জন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং অলসতা ত্যাগ করো।

(৫) অবৈধ সম্পর্ক : অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করা মানেই জীবনকে ধ্বংস করা। শিক্ষাজীবনে অবৈধ সম্পর্কে গড়লে পড়ালেখার ব্যাঘাত ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। অনেক শিক্ষার্থীর জীবন ধ্বংসের পেছনে কারণ এটাই। কোনো শিক্ষার্থী যখন অবৈধ সম্পর্ক করবে, তখন তোমার চিন্তা হবে যে তার সাথে কখন কথা বলবে, কখন দেখা করবে। এটা নিয়ে চিন্তায় বিভোর থাকবে। আর তুমি যার সাথে সম্পর্ক গড়েছো সে কিন্তু ঠিকই পড়ালেখা করছে। আর যদি দুই জনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে তো তোমার জীবন শেষ। এখন হয় তুমি পড়ালেখা বাদ দিবে, না হয় নেশা করবে। অথচ আল্লাহ তাআলা নিষেধ করে বলছেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা যেনা থেকে নিষেধ করেছেন। কাজেই অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এটা তোমার জীবনকে ধংস করে ছাড়বে।

আল্লাহ আমাদের উক্ত সকল বিষয় থেকে বেঁচে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

"তাক্বওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম" প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(৪) ইহসান করা : কারো সাথে ভালো ব্যবহার করা ও কারো উপকার করাকে ইহসান বলে। তাক্বওয়া যাদের আছে তারাই এটা করতে পারে।

(৫) যিকিরকারী হওয়া : যিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা। অর্থাৎ সবরকম কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, ভাব-ভাষা এবং মনে ও মুখে আল্লাহর স্মরণকে যিকির বলা হয়। তাছাড়া বলা যায়, আল্লাহর বিধান মেনে চলাই প্রকৃত যিকির। যার ভিতরে আল্লাহর স্মরণ আছে তার তাক্বওয়া আছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ 'অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব, তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচারী হয়োও না' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫২)*।

(৬) শোকরকারী হওয়া : আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ভোগ করে বিনয়ের সাথে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এটা মুত্তাক্বী ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। আল্লাহ বলেন, ﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ 'যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছো, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৪)*।

(৭) কর্তব্যপরায়ণ হওয়া : তাক্বওয়া থেকে উৎসারিত আরেকটি গুণ হলো কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের জন্য, সৃষ্টির জন্য যা কল্যাণকর তা করা। স্বামী-স্ত্রী, ছোট-বড়, আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রতিবেশী, পিতা-মাতা, ভাই-বোনের প্রতি যা কর্তব্য আছে, তা পালন করা।

(৮) হালাল উপার্জন : হালাল উপার্জনকারী ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে নিজেকে তাক্বওয়াবান বা মুত্তাক্বী দাবি করতে পারে। যার উপার্জন হারাম সে আর যাই হোক তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ 'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য আছে, তা তোমরা আহার করো, তবে শয়তানের পথ অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৮)*।

(ইনশা-আল্লাহ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

ভূমিকা: গত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তীনের মজলুম মুসলিমদের উপর ইসরাঈলের জায়োনিস্ট ইয়াহূদীবাদী কর্তৃক নির্যাতন, জুলুম, অত্যাচারের যে স্টিমরোলার চলে আসছে তা কমা তো দূরের কথা; দিন দিন বেড়েই আছে। কিছুদিন পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস-কেন্দ্রিক কিছু ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের প্রতিবাদে গাজার সাহসী মুসলিমগণ ইসরাঈলে যে পালটা হামলা করেন তারই প্রেক্ষিতে গাজার উপর ইসরাঈলী সন্ত্রাসীদের ভয়ংকর, স্মরণকালের ভয়াবহ হামলার যে দৃশ্য পৃথিবীবাসী দেখে এসেছে তা হাজার মাইল দূরে থেকেও আমাদের হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস ইতোপূর্বেও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়েছিল। সুদীর্ঘ শত বছর পর মুসলিমগণ পুনরায় সেটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে মুসলিমদের জেরুযালেম বিজয়ের ইতিহাস শুধু ক্রুসেড-কেন্দ্রিক সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর ইতিহাস নয়; বরং হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন নবীর জীবনে জেরুযালেম ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। আমরা এই প্রবন্ধে ইতিহাসের পাতা থেকে জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাসের শিক্ষণীয় চুম্বাকাংশগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় মসজিদ: প্রথমত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ ‘নিশ্চয়ই মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর হলো সেটা, যা রয়েছে মক্কা নগরীতে। তা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত’ *(আলে ইমরান, ৩/৯৬)*। আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, আল-মাসজিদুল হারাম তথা কা‘বাঘর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল-মাসজিদুল আক্বছা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কত দিনের? রাসূল ﷺ বললেন, ৪০ বছরের।[১]

মুহাদ্দিছ ও মুফাসসিরগণ এই হাদীছের ব্যাখায় বলেছেন, হতে পারে আদম আলাইহিস সালাম-ই সর্বপ্রথম কা‘বা তৈরি করেছেন এবং তিনিই বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরি করেছেন ৪০ বছর পর। আবার কারো মতে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম কা‘বা তৈরি করেছেন এবং তার ৪০ বছর পর তাঁর ছেলে ইসহাক বা ইসহাকের ছেলে ইয়াকূব আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরি করেছেন। প্রথম মন্তব্যটি বেশি গ্রহণযোগ্য। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ‘যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি নির্মাণ করছিল, তখন তারা বলছিল- হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এই কাজকে কবুল করুন! নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী’ *(আল-বাক্বারা, ২/১২৭)*।

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঘরটি আগে থেকেই ছিল, ঘরের সীমানা ও ঘরের মাপ পূর্ব থেকেই ছিল, পূর্ব থেকে থাকা সেই ঘরের উপর নতুন করে দেওয়াল তুলছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সন্তান ইসমাইল আলাইহিস সালাম। এই আয়াত প্রমাণ বহন করে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পূর্ব থেকেই কা‘বা ছিল। সুতরাং আদম আলাইহিস সালাম বা তাঁর কোনো সন্তান বা তাদের হাত দিয়েই সর্বপ্রথম কা‘বা বায়তুল্লাহ এবং তার ৪০ বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয়েছে এই মতটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।

জেরুযালেম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দারুল হিজরা ও লূত আলাইহিস সালাম-এর আশ্রয়স্থল: আমরা জানি, ইরাকের ব্যাবিলন নগরীতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক অত্যাচারিত, নির্যাতিত, বিতাড়িত হয়ে হিজরত করে যে শহরে আসেন সেটাই জেরুযালেম। একইভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ভাতিজা লূত আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমকে আল্লাহ

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২৫।

সুবহানাহু ওয়া তাআলা শহর উল্টিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেন। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরই মূলত আজেকর জর্ডানের ডেড সী বা মৃত সাগর। লূত আলাইহিস সালাম-এর অভিশপ্ত ক্বওমের শহরটি উল্টিয়ে দেওয়ার পর সেখান থেকে লূত আলাইহিস সালাম-কে উদ্ধার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেখানে নিয়ে এসেছিলেন সেটাই জেরুযালেম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ 'আমি ইবরাহীম এবং লূতকে উদ্ধার করে সেই জায়গায় নিয়ে এসেছি যেখানে আমি বরকত রেখেছি পৃথিবীবাসীর জন্য' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৭১)*। এই আয়াতে মহান আল্লাহ জেরুযালেমকে পৃথিবীবাসীর জন্য বরকতময় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম জেরুযালেমের সাথে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সম্পর্ক রয়েছে এবং জেরুযালেমের সাথে লূত আলাইহিস সালাম-এর সম্পর্ক রয়েছে।

জেরুযালেম ও মক্কার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী ইবরাহীম: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে বসবাস করেন তখন কোনো একসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি তাঁর স্ত্রী সারাকে নিয়ে খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিশর যান। মিশরের তৎকালীন জালেম বাদশাহ কর্তৃক তাঁর স্ত্রীকে হয়রানির অপচেষ্টার ঘটনা আমাদের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে, যা আমরা অনেকেই জানি। সেই ঘটনার পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাজেরা (আ.)-কে উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে জেরুযালেমে ফেরত আসেন। অতঃপর হাজেরা (আ.)-এর গর্ভে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে মক্কার কা'বাঘর বা বায়তুল্লাহর পাশে রেখে আসেন। উল্লেখ্য যে, এখান থেকেই বায়তুল মুকাদ্দাসের সাথে কা'বা তথা জেরুযালেমের সাথে মক্কার সম্পর্ক শুরু হয়। নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজে এক স্ত্রীকে নিয়ে জেরুযালেমে থাকতেন, আরেক স্ত্রীকে তিনি কা'বাঘরের পাশে রেখে এসেছেন। এই সম্পর্ক শুধু একদিনের নয়; বরং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ফিলিস্তীন থেকে বায়তুল্লাহয় কয়েকবার যাতায়াত করেছেন। কখনো সন্তানকে রাখতে গিয়েছেন, কখনো আল্লাহর নির্দেশে সন্তানকে কুরবানী করতে গিয়েছেন, কখনো তিনি কা'বা নির্মাণ করতে গিয়েছেন। এইভাবে জেরুযালেমের সাথে মক্কার এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সাথে কা'বাঘরের স্থায়ী যোগসূত্র ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে স্থাপিত হয়।

ইসহাক ও ইয়াকূব আলাইহিমাস সালাম-এর কবর জেরুযালেমের হেবরন শহরে: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর প্রথম স্ত্রী সারাহ (আ.)-এর গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রীর গর্ভে ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর অপর নাম হচ্ছে ইসরাঈল, যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর ১২ সন্তান। এই ১২ সন্তানের পরবর্তী বংশধরকেই বানূ ইসরাঈল বা ইসরাঈলের বংশধর বলা হয়ে থাকে। এই ১২ সন্তানের পরবর্তী বংশধরদের নিয়ে অনেক ঘটনাবলি ও ইতিহাস রয়েছে। এই প্রবন্ধে শুধু তাদের সাথে এই মাটির সম্পর্ক দেখব।

কথিত আছে, ইসহাক আলাইহিস সালাম তাঁর শ্বশুরবাড়িতে মারা যান। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, তার অছিয়ত অনুযায়ী জেরুযালেমে তাঁকে দাফন করা হয় এমনকি ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-কেও তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী জেরুযালেমে করা দাফন হয়। সেটার কিছু আলামত আমরা দেখি যে, বর্তমান ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরের 'আল-খালীল' নামক জায়গায় যেটাকে হিব্রুতে 'হেব্রোনো' বলা হয়, সেখানে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব আলাইহিমুস সালাম সকলের কবর রয়েছে। সুতরাং এখান থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পরবর্তী তিন জনের জীবনেই জেরুযালেমের সম্পর্ক ছিল অনেক সুগভীর ও নিবিড়। তাঁরা সকলেই এই জেরুযালেমে বসবাস করেছেন এবং এখানেই থেকেছেন এবং এখানেই তাদের কবর।

মূসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনে জেরুযালেম: ভাইদের ষড়যন্ত্রে নির্যাতিত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কৃতদাস হয়ে বন্দী অবস্থায় আযীযে মিশরের নিকট বিক্রি হন এবং তার প্রাসাদের কাজের লোক হিসাবে নিযুক্ত হন। তখন পর্যন্ত মিশরের ক্ষমতায় ফেরাউনরা আসেনি। ঐতিহাসিকগণ তৎকালীন

শাসকদেরকে 'হাকসুস' নামে অভিহিত করেছেন। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 'আযীয' বা 'আযীযু মিসর' বলছেন।

ঘটনার এক পর্যায়ে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদেরকে তাঁর পিতাসহ মিশরে ডেকে পাঠান। তখন ইয়াকূব আলাইহিস সালাম তাঁর ১২ সন্তান ও তাদের সন্তানাদি, পৌত্র-প্রোপৌত্রসহ প্রায় ৭০ জনের বিরাট পরিবার নিয়ে তিনি জেরুযালেম থেকে এই প্রথম মিশরে চলে আসেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর পরে ঐতিহাসিকদের দাবি অনুযায়ী প্রায় ১৫০ বছর যাবৎ বানূ ইসরাঈলগণ তাওহীদের উপর শান্তিতে ও সুখের সাথেই মিশরে জীবনযাপন করতে থাকে। তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তৎকালীন মিশরের বাদশাহর সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভালো সম্পর্কের কারণে; তাঁর মৃত্যুর পরও সেই ভালো সম্পর্ক বাদশাহর পরবর্তী উত্তরসূরিদের সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর পরবর্তী উত্তরসূরি বা বানূ ইসরাঈলের সাথে সেই সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকে। ১৫০ বছর পর হাকসুস বংশের পতন হলে ফেরাউনরা যখন মিশরের ক্ষমতা দখল করে, তখন তারা পূর্বের সরকারের সাথে যাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তার অন্যতম একটি অত্যাচার ছিল, ফেরাউন বানূ ইসরাঈলের পুরুষ সন্তানদেরকে ধরে ধরে যবেহ করত। শুধু মেয়ে সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। এটা ছিল তার অত্যাচারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অত্যাচার। এ অত্যাচারের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সাহায্য দিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম-কে ফেরাউনের বাড়িতে লালনপালন করেন। অতঃপর কালের পরিক্রমায় শত অত্যাচার ও পরীক্ষা সহ্য করে মহান আল্লাহর নির্দেশে মূসা আলাইহিস সালাম বানূ ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে ফেরাউন লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়।

কিন্তু এই ঘটনায় আমরা অনেকেই জানি না যে, মূসা আলাইহিস সালাম আসলে মিশর ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, মূসা আলাইহিস সালাম মিশর ছেড়ে পালালেন, ফেরাউন ডুবে গেল, তাহলে তিনি কেন পুনরায় মিশরে ফিরে গিয়ে মিশরের এই বিশাল সাম্রাজ্য দখল করলেন না। যদি আমরা জানতাম যে, আসলে মূসা আলাইহিস সালাম কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, তাহলে আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসত না। মূলত মূসা আলাইহিস সালাম তৎকালীন যুগ থেকে সাড়ে ৪০০ বছর আগে তাঁর বাপ-দাদা আদি পুরুষ ইউসুফ, ইসহাক, ইয়াকূব, ইবরাহীম আলাইহিমুস সালাম যেই পবিত্র ভূমিতে থাকতেন, লূত আলাইহিস সালাম যেই পবিত্র ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই জেরুযালেমে ফিরে যাচ্ছিলেন। যেই জেরুযালেম তার পিতা-মাতার আদি ভিটা, যেই জেরুযালেম থেকে সাড়ে ৪০০ বছর পূর্বে তাঁর আদি পিতা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম ৭০ জন সদস্য নিয়ে মিশরে এসেছিলেন, আদি ভিটায় ফিরে যাওয়ার জন্য মূলত তারা রওনা দেন। এই কারণেই মিশরে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। বরং মূসা আলাইহিস সালাম-এর জেরুযালেমে যাওয়ার আগ্রহ কতটা উদগ্র, কতটা দৃঢ় এবং কতটা তিনি আশায় বুক বেঁধে ছিলেন জেরুযালেমে প্রবেশ করার জন্য তাও আমরা দেখব ইনশা-আল্লাহ।

সুধী পাঠক! আপনারা গুগল ম্যাপ চেক করলেও দেখবেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে যে মরুভূমিতে উঠেছিলেন সেটাই মূলত সিনাই মরুভূমি। যে তূর পাহাড়ে তিনি তাওরাত পেয়েছিলেন সেটাও এই সিনাই মরুভূমিতে। এই মরুভূমিতে কোনো পানি ও খাবারের ব্যবস্থা না থাকার কারণেই মহান আল্লাহ আসমান থেকে তাদের জন্য মান্ন ও সাল্ওয়া পাঠালেন এবং পাথর বিদীর্ণ করে ঝরনা প্রবাহিত করলেন। বানূ ইসরাঈলের সাথে মূসা আলাইহিস সালাম-এর যত ঘটনার কথা মহান আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোই এই মরুভূমিতে সংঘটিত হয়েছে। যেমন— গো-বৎস পূজা, বানূ ইসরাঈলের আল্লাহকে দেখতে যাওয়ার পরিণতিতে মারা যাওয়া অতঃপর তার দয়ায় পুনরায় জীবিত হওয়া, তূর পাহাড়কে তুলে ধরা ইত্যাদি। যাই হোক মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু মিশর ছেড়ে এই মরুভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন মূলত জেরুযালেমে প্রবেশ করার জন্য। দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাই তিনি মহান আল্লাহর কাছে যুদ্ধের আদেশ পান জেরুযালেম বিজয়ের জন্য।

(চলবে)

তওবা : ফিরে আসার গল্প

-ওমর বিন শফিক*

আজও রবি পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছে। আলো চারিদিকে মিটিমিটি করে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্যের কিরণে শিশিরভেজা দূর্বাঘাস ঝলমল করছে। ভুল করে কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হয়নি। আর কেনইবা সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হবে? সচরাচর সূর্য তো পূর্ব দিক থেকেই উদিত হয়। এটাই তো তার রুটিন, যা পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই চলে আসছে। তাহলে কেনইবা সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হবে কোনো একদিন? কী বা রহস্য তার মধ্যে? কী উদ্দেশ্য রয়েছে তার মাঝে? আমাদের প্রভু পৃথিবীতে কোনো কিছুই তো উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃজন করেননি। আমরা হয়তো অনেকে বুঝে ফেলেছি। তারপরও কেনো আমরা ঘুরে দাঁড়াই না? কেনই বা আমরা ফিরে আসি না? তাহলে চলো! এবার আমরা একটি ফিরে আসার গল্প শুনে আসি।

বানূ ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির গল্প। সে ছিল অতি ভয়ংকর এক মানব। সে ছিল সমাজের ৮-১০ জন মানুষের থেকে একদম আলাদা। তাকে অবলোকন মাত্র ভয়ে কুঁকড়ে উঠত হাজারো হৃদয়। কারণ সে ছিল অতি ভয়ংকর একজন খুনী। সে খুন করেনি ৫ জন, ১০ জন, ৫০ জন, বরং সে খুন করেছিল ৯৯ জন। ৯৯ জনকে হত্যা করার পর তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার মনে হাজারো অনুশোচনা উঁকি দিল। মনকে তৃপ্ত করার জন্য সে যারপরনাই কোশেশ করতে লাগল। সহসাই দেখা হয়ে গেল এক বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে। তার অনুশোচনা-মিশ্রণ হৃদয় যে, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আগ্রহী, তাই সে বুজুর্গকে জিজ্ঞেস করল, নিষ্কৃতির কোনো পন্থা আছে কি? সে নিরীক্ষণসহ তাকিয়ে রইল বুজুর্গের প্রতি। বুজুর্গ ভাবগাম্ভীর্য কণ্ঠে বলে উঠল, তোমার কোনো নিষ্কৃতি নেই। এরপর সে ক্রোধে তাকেও হত্যা করল। এবার পুরা হলো ১০০ লোক। হ্যাঁ, সে ১০০ লোক হত্যা করেছে।

তারপরও তার অন্তর শান্তি পায়নি। বরং তার অন্তর পূর্বের চেয়ে বেশি অনুশোচনায় ভুগছে। সে পুনরায় কলুষ মোচনের অভিপ্রায়ে উন্মাদের মতো হাঁটছে। অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হলো এক প্রৌঢ়ের সাথে। প্রৌঢ় বুঝতে পেরে তাকে বললেন, ঐ পল্লিতে একজন আলেম আছেন। তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করো। তার অন্তরে অনুশোচনার প্রদীপ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সে ব্যাকুল হয়ে উঠল প্রভুর আরাধনায় ফিরে আসতে। পুনরায় সে পদক্ষেপ গ্রহণ করল। তারপর তার জীবনের আয়ুর মাঝে নেমে এলো অন্ধকার। মালাকুল মাউত এসে তার রূহ নিয়ে গেলেন। তার অনুশোচনা নিঃশেষ হয়ে গেল। নিথর দেহ মৃত্তিকায় পড়ে রইল। প্রভুর আরাধনায় প্রত্যাবর্তন হলো না। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পর কী ঘটল, সে সম্পর্কে আমরা কি অবগত?

কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার আত্মাকে নেওয়ার জন্য দু'দল ফেরেশতা আগমন করলেন। এক দল ফেরেশতা উৎকৃষ্ট আত্মা নেওয়ার দায়িত্বে। অপর দল দুষ্ট আত্মা নেওয়ার দায়িত্বে। দুই দল ফেরেশতার মধ্যে বাক-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে গেল। কারণ এক দল ফেরেশতা বলছেন, আমরা তার আত্মা নিব। আরেক দল বলছেন, না, আমরা নিব। যারা মন্দ আত্মা নেওয়ার দায়িত্বে তারা বিপরীত দলকে বললেন, তোমরা কেনো এই আত্মাকে নিয়ে যাবে? সে তো পাপী! সে তওবা করে পরকালে আগমন করেনি। পুণ্য আত্মার ফেরেশতারা বলে উঠলেন, সে তো তওবা করার উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হচ্ছিল। তাই আমরাই তার আত্মা নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হব। এভাবেই কিছুক্ষণ তাদের মাঝে তুমুল আকারে বাক-বিতণ্ডা চলল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা আসল যে, তোমরা তার জায়গার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো। সে যেখান থেকে অগ্রসর হয়েছিল এবং যেখানে থেমেছিল, ঐটুকু জায়গা পরিমাপ করো। আর সে যে জায়গায় রয়েছে, সেখান থেকে আলেমের গ্রাম পর্যন্ত জায়গার পরিমাপ করো। যদি আলেমের গ্রাম অবধি জায়গা কম হয়, তাহলে তার আত্মা নিবে জান্নাতী ফেরেশতা। আর বেশি হলে, তার আত্মা নিবে জাহান্নামী ফেরেশতা। জায়গা পরিমাপ করার পর দেখা গেল, আলেমের গ্রামের দিকে কিছু পরিমাণ জায়গা কম। সাথে সাথেই তার আত্মা জান্নাতী ফেরেশতাগণ নিয়ে যান। হয়ে যায় সে জান্নাতীদের একজন। পেয়ে যায় জান্নাতে বসবাসের টিকেট। চিরস্থায়ী শান্তি-নিকেতনের ঠিকানা। পূরণ হয় তার মনের ব্যাকুলতা।

কীসের অভিপ্রায়ে সে ফিরে পেল সফলতা? সে কি তার রবের আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, তাই? হ্যাঁ, সে ফিরে আসতে পেরেছে রবের শান্তি-নিকেতনে। রব খুশি হয়েছে তার প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ দেখে। ১০০ হত্যা করার পরও রব তার পাপ মার্জনা করে দিলেন। সে কিন্তু তওবাও করেনি, বরং তওবা করার প্রবল অভিলাষ করেছিল। এটাতেই প্রভু মহা আনন্দিত। তাহলে আমরা কেনো এত বিষাদগ্রস্ত? কেনো আমরা ফিরে আসছি না প্রভুর শান্তি-নিকেতনে? কেনো প্রত্যাবর্তন করি না প্রভুর নিকট? আমাদের কলুষ অনেক বেশি, তাই ভেবে? পাপ নিয়ে বিষাদগ্রস্ত? প্রভু মার্জনা করবে কিনা এই মনে করে?

হে প্রিয় ভাই! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের দরবারে। যেখান থেকে কেউ ফিরে যায় না শূন্য হাতে। যেখানে এসে সবাই পায় শান্তির সূচনালগ্ন। বানূ ইসরাঈলের সে ব্যক্তি যদি ১০০ হত্যা করার পরও শুধু তওবার অভিলাষ করার কারণে প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জান্নাত উপঢৌকন দেন, তাহলে তোমাকে কেনো নিষ্কৃতি দেবেন না? তোমার পাপ থেকে যদি তুমি প্রত্যাবর্তন করো প্রভুর নিকটে তওবার মাধ্যমে, তাহলে তোমাকে কেনো নিষ্কৃতি দেবেন না? তারপরও কি তুমি ফিরে আসবে না, প্রিয় ভাই আমার? কেনো তুমি নিমজ্জিত রয়েছ হাজারো পাপের সাগরে? ফিরে এসো বেলা ফুরাবার আগেই। এখনো তোমার জীবনের আয়ু ফুরিয়ে যায়নি। এখনো উপস্থিত হননি মালাকুল মাউত। তোমার দুয়ারে এখনো আসেনি মৃত্যু-চিঠি। এমনকি সূর্যও উদিত হয়নি পশ্চিম দিগন্তে। তওবার দ্বার এখনো উন্মুক্ত। অতএব, ফিরে এসো! আর আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*।

* আলিম ১ম বর্ষ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

বীর

-মিফতাউল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

মায়ের স্নেহ-মমতা দেখো ঠিক এক সুশ্রী মধু,
তুমি বীর, তোমার আছে সুশ্রী অতীত
ভুলছ কী করে তুমি জাতিতে উন্নীত,
তুমি উমার, হামযার উত্তরসূরি
তুমি নম্রের উদাহরণ, প্রয়োজনে তরবারী।
তুমি ঝোঁকে মাতো কত আছে কাজ বাকি
শানিয়ে নাও নিজেকে আসবে মাহদী।
তুমি সাহসী, হবে মাহদীর কাণ্ডারি,
তুমি ভাঙবে শৈল, গড়বে রণতরি।
তুমি যুদ্ধজয়ের বিজয়ী সৈনিক
তুমি বীর, তুমি শত্রুদের প্যানিক।

জ্ঞানী হওয়া চাই

-আবূ বকর বিন আলতাফ
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জ্ঞানী হতে হবে তোমায়
জ্ঞানী হওয়া চাই,
জ্ঞান ছাড়াতো এই ধরাতে
কোনো মূল্য নাই।
চলার পথে বিদ্যা তোমার
লাগবে সদা সাথে,
শিখতে থাকো জানতে থাকো
প্রভাতে ও রাতে।
কুরআন পড়ো, হাদীছ পড়ো
পড়তে যত পারো,
পড়বে যত জানবে তত
জ্ঞানী হবে আরো।
জ্ঞান ছাড়া আজ কোথাও কারো
হচ্ছে না যে ঠাঁই,
সবার মুখে একই কথা
জ্ঞানী হওয়া চাই।

মসজিদে চলো

-শাকিব হুসাইন
পাকেরহাট, খানসামা, দিনাজপুর।

ফজর হলে উঠে মুমিন
মসজিদ পানে যাও,
ছালাত পড়ো যিকির করো
রবের গান যে গাও।
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভালো
খুবই সম্মানের,
পাবে তুমি মহান রবের
ভালোবাসা ঢের।
রবের ভালোবাসা পেলে
হবে সফলকাম,
ওই পারেতে পাবে তুমি
ভালোবাসার দাম।

আল্লাহর সৃষ্টি

-আব্দুল বাসীর
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

যেদিকে যায় মোদের দৃষ্টি
সেদিকে দেখি শুধু আল্লাহর সৃষ্টি।
যার আদেশে চলে পুরো বিশ্বজগৎ
মোরো দেখি শুধু তারই নেয়ামত।
আকাশ-পাতাল সবকিছু সব এক আল্লাহর দান
প্রভাতে পাখির কলরবে শুনি আল্লাহু আকবার।
মহান প্রভু পাহাড়ের বুকে দিলেন ঝর্ণাধারা
সৃষ্টিকুলে মানবজাতিকে করলেন সৃষ্টির সেরা।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমাদের এই ধরণি ভরা
আল্লাহর অপূর্ব সব সৃষ্টি মনকে দেয় নাড়া।

বন্ধন

-ওমর ফারুক
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

এই জগতে বাবা হলো বটবৃক্ষের ছায়া,
এই জগতে শ্রেষ্ঠ আদর মায়ের করা মায়া।
এই জগতে ভাইয়ের মতো কেউ করে না আদর,
সারা জীবন হতে চাই সেই আদরের চাদর।
এই জগতে বোন হলো আত্মার আত্মা বন্ধন,
সেই কারণে একজনের দুখে আরেকজনের কান্দন।
মায়া-মহব্বত সৃষ্টি করল যেই মা'বূদ রব্বানা।
সব হালতে স্মরণ রেখো তারে ভুলো না।

বাংলাদেশ সংবাদ

বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর হলো বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। সংস্থাটির তালিকায় শীর্ষ ২০ ধীরগতির শহরের মধ্যে আরো রয়েছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং কুমিল্লা। অথচ যানজট নিরসন করে শহরকে গতিময় করতে ২০১২ সালের পর থেকে গত এক দশকে সড়ক, সেতু, মেট্রোরেল, উড়ালসড়কসহ নানা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই সময়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ এবং মেট্রোরেলের একটি রুটের একাংশ ছাড়াও শহরের মধ্যে ছোট-বড় অন্তত সাতটি নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণ করেছেন সরকার। কিন্তু তাতে কোনো কোনো জায়গায় যানজট কমে আসলেও শহরের সার্বিক যানজট অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায়শই কোনো কোনো জায়গায় ফ্লাইওভারের ওপরেও দীর্ঘ সময়ের যানজট দেখা যাচ্ছে। এখানে একই সড়কে ১৮ ধরনের যানবাহন চলছে। গতি আসবে কীভাবে? মূল সড়কগুলোর পাশে নিয়মনীতি না মেনে বাণিজ্যিক ভবন তৈরি করা হয়েছে। জংশন বা স্টেশনগুলোতে ইন্টারচেঞ্জ বানানোর সুযোগই রাখা হয়নি। এসব ফ্লাইওভার কিছু কিছু পয়েন্টে যানজট কমালেও শহরজুড়ে যানজটের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার অবসান কবে কীভাবে হবে তা কারও জানা নেই।

দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হাজার ছাড়াল

চলতি বছরের পহেলা অক্টোবর নাগাদ দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ৬ জনের মৃত্যু হলো। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে ২ হাজার ৮৮২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২ লাখ ৬ হাজার ২৮৮ জন রোগী। তন্মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ৮৩ হাজার ৮৫১ জন এবং ঢাকার বাইরে ১ লাখ ২২ হাজার ৪৩৭ জন। এবার ডেঙ্গু দেশের সব জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। জুলাই মাসের শেষ দিকে ঢাকার চেয়ে ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু রোগী বেশি হাসপাতালে ভর্তি হয়। এখনো ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দ্বিগুণ বা এর বেশি হারে। ঢাকার বাইরে মৃত্যুও বাড়ছে। জনস্বাস্থ্যবিদগণ আশঙ্কা করছেন, এবার ডেঙ্গু দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কারণ, থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে, কমছেই না। আবার এর সঙ্গে আছে তীব্র গরম। এ ছাড়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় তৎপরতারও অনেকটাই অভাব আছে। দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সর্বোচ্চ ২৮১ জনের মৃত্যুর রেকর্ড ছিল গত বছর। এ ছাড়া ডেঙ্গুতে ২০১৯ সালে মৃত্যু হয়েছে ১৭৯ জনের। ২০২০ সালে ৭ জন এবং ২০২১ সালে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় ১০৫ জনের।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ইউরোপে স্বপ্নের অভিবাসন : চলতি বছরে ২৫০০ জনের মৃত্যু

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে ২ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি অভিবাসী মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে। এই সংখ্যাটি ২০২২ সালের একই সময়ের মধ্যে ১,৬৮০ মৃত বা নিখোঁজ অভিবাসীর চেয়ে অনেক বেশি। সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশগুলো থেকে স্থলপথে যাত্রার পর অভিবাসীরা তিউনিসিয়া এবং লিবিয়ান উপকূল থেকে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার এই রুট বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অভিবাসী এবং উদ্বাস্তুরা প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু এবং চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকিতে রয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর নাগাদ দক্ষিণ ইউরোপে সমুদ্রপথে মোট প্রায় ১ লাখ ৮৬ হাজার লোক ইতালি, গ্রীস, স্পেন, সাইপ্রাস এবং মাল্টায় এসেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ, ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি মানুষ ইতালিতে এসেছেন, যা ২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রস্থান পয়েন্ট হিসাবে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে অনুমান করা হয়, ১ লাখ ২ হাজারের বেশি শরণার্থী এবং অভিবাসী তিউনিসিয়া থেকে এবং ৪৫ হাজার লিবিয়া থেকে সাগর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তিউনিসিয়ায় আনুমানিক ৩১ হাজার জনকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বা আটকানো বা নামানো হয়েছে এবং লিবিয়ায় ১০ হাজার ৬০০ জনকে আটকানো বা নামানো হয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

আফগানিস্তানে ব্যাপক উন্নয়ন

আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক জোটের পতনের পর, দুই বছর পূর্বে ২০২১ সালের আগস্ট মাসে তালেবান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। সে সময় দেশটি বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা থেকে একরকম ছিটকে পড়ে। পশ্চিমা মিত্রদেশগুলো থেকে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আসতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র কূটকৌশল করে দেশটির ৯৫০ কোটি মার্কিন ডলার রিজার্ভ জব্দ করে। তন্মধ্যে ৩৫০ কোটি ডলার ছেড়ে দিতে চাইলেও পরে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তা স্থগিত করে। এহেন পরিস্থিতিতে আফগানির মুদ্রা মান পড়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু তা ঘটেনি। চলতি ত্রৈমাসিকে দেশটির মুদ্রা আফগানির দর বেড়েছে ৯ শতাংশ। সব মিলিয়ে এই বছর আফগানির দর বেড়েছে ১৪ শতাংশ। ফলে চলতি বছরে বিশ্বের যে সব দেশের মুদ্রার দর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, তাতে আফগানির অবস্থান তৃতীয়। এর আগে আছে কলাম্বিয়া ও শ্রীলঙ্কার মুদ্রা। আফগানিস্তানের হাতে নগদ অর্থের অপ্রতুলতা থাকলেও তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা রয়েছে। শুধু লিথিয়াম যে পরিমাণে আছে তার বর্তমান বাজার মূল্য তিন ট্রিলিয়ন (তিন কোটি মার্কিন ডলার)। তালেবান সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ লৌহ, আকরিক ও স্বর্ণ এবং তেল উত্তোলনের জন্য চীনা, ব্রিটিশ ও তুর্কির নানা কোম্পানির সাথে ৬৫০ কোটি মার্কিন ডলারের চুক্তি করে। এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে নানা অভাবনীয় উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

আসছে তারবিহীন বিদ্যুৎ

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। যত দিন যাচ্ছে আরো আপডেটেড হচ্ছে। তবে ইলেকট্রিসি ছাড়া ইলেকট্রিক ডিভাইস চালানো সম্ভব? হ্যাঁ, এটাও সম্ভব। ভবিষ্যতে তার ছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। টিভি, ফ্রিজ, ফ্যানসহ যাবতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালাতে কোনোরকম বিদ্যুৎবাহী তারের আর প্রয়োজন হবে না। এই সিস্টেমটি মোবাইল নেটওয়ার্কের মতো কাজ করবে। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সফল হয়েছে। ১৯৮০ সালে প্রথম এই সিস্টেমটি আবিষ্কার করেছিলেন মহান বিজ্ঞানী টেসলা। এটা সেসময় টেসলা কয়েল নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই বিষয়টি নিয়ে সেইভাবে কোনো গবেষণা হয়নি। তবে বর্তমানে এই প্রযুক্তিটিকে নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। টেসলা কয়েলের সাহায্যে বিদ্যুৎ পাঠানো সম্ভব হয়েছে। সেজন্য কোনো বিদ্যুৎ সংযোগকারী তার লাগবে না। গবেষণাটি করা হয়েছে ইউএস নেভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে। সেখানকার বিজ্ঞানীরাও টেসলার মতোই অনুরূপ একটি কয়েল তৈরি করেছেন। এক কিলোমিটারে ১.৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাঠাতে সক্ষম হবে। পুরো পদ্ধতিটি টেসলার নীতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে। টেসলার সিস্টেম অনুযায়ী বিদ্যুৎকে প্রথমে মাইক্রোওয়েভে রূপান্তরিত করতে হবে, এরপর রিসিভারের একটি বিমে ফোকাস করা লাগবে। সেখানে থাকে আরএফ ডায়োড-সহ একটি এক্স-ব্যান্ড ডাইপোল অ্যান্টেনা। যখন মাইক্রোওয়েভগুলো অ্যান্টেনার সাথে মিলিত হয়, তখন কারেন্ট উৎপন্ন হয়। আগেও কয়েকটি দেশে এ ধরনের গবেষণা করা হয়েছে, তবে তারা সফল হয়নি। কিন্তু এখন তা সম্ভব হয়েছে। আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রযুক্তির বিকাশের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছন। প্রযুক্তিটি একবার সফল হলে তা মানুষকে অবিশ্বাস্য রকমের সুবিধা প্রদান করবে। ওয়াইফাইয়ের মতো ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আকীদা

প্রশ্ন (১) : হিন্দুদের কোনো শিশু সন্তান জন্মের পরপরই মারা গেলে সে জান্নাতী হবে না-কি জাহান্নামী?

-সাজেদুল ইসলাম
চট্টগ্রাম।

উত্তর : নাবালক অবস্থাতে যেই শিশু সন্তানরা মারা যাবে তারা জান্নাতী হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে- (১) নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যতক্ষণ না বালেগ হয়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯৮)। রাসূল ﷺ স্বপ্নে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর পাশে যেসব সন্তানদেরকে দেখেছিলেন, তাদের মধ্যে মুশরিকদের সন্তানও ছিল (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪৭)। এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, হিন্দুদের কোনো সন্তানও জন্মের পরপর মারা গেলে সে জান্নাতী হবে।

প্রশ্ন (২) : কোনো এক মসজিদের ডান পাশে মসজিদের পার্শ্ব ঘেষে (পারিবারিক) কবরস্থান রয়েছে। জমির মালিক ও মসজিদ কমিটিকে সালাফী মানহাযের শায়খদের বক্তব্য শোনালেও বিষয়টির প্রতি তারা কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। বিষয়টি এভাবেই থেকে যাওয়ায় ইমাম মসজিদ ত্যাগ করতে চাইলে ইমামকে সান্ত্বনা দিয়ে জমির মালিক কবরস্থান ও মসজিদের মাঝে নেটের বেড়া দিয়েছে। কবর ও মসজিদকে পৃথক করণার্থে জমির মালিকের উক্ত কাজ কি যথেষ্ট হবে? এক্ষেত্রে ইমাম, মসজিদ কমিটি, মসজিদের মুছল্লী এবং জমির মালিকের করণীয় কী?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে করণীয় হলো, কোনো দেওয়াল দেওয়ার মাধ্যমে কবরস্থান আর মসজিদকে পৃথক করা। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না এবং কবরের ওপর বসো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২)। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে কিংবা তার উপর বসতে অথবা তার উপর ছালাত আদায় করতে (মুসনাদে আবী ইয়ালা, হা/১০২০; তাহযীরুস সাজিদ, পৃ. ২৯, সনদ ছহীহ, হায়ছামী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না কিংবা কবরের উপর ছালাত আদায় করো না' (ত্বাবারানী, আল মু'জামুল কাবীর, হা/১২০৫১; তাহযীরুস সাজিদ, পৃ. ২৯) আমর ইবনু দীনার থেকে বর্ণিত, তাকে কবরের মাঝে ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'বনু ইসরাঈলের লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে ফেলেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের অভিশাপ করেন' (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/১৫৯১; তাহযীরুস সাজিদ, পৃষ্ঠা ২৯)। নাফে ইবনু যুবায়ের বলেন, কবরের মাঝে ছালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করা হতো (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/১৫৯০)। আর সাধারণত নেটের বেড়াকে দেওয়াল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তাই শুধু নেটের বেড়া দিয়েই সীমাবদ্ধ থাকলে তা যথেষ্ট হবে না, বরং ইট বা অন্য কিছু দিয়ে ভালোভাবে দেওয়াল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩) : জনৈক আলেম তার কোনো এক বক্তব্যে বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে পারে না, তার জন্য অন্যান্য কিতাব পড়াও হারাম, অন্য কারো বক্তব্য শুনাও হারাম এবং কোনো সংগঠন করাও হারাম। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-সোহেল রানা
গাজীপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা আবূ মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলা লেবুর মতো যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খেজুরের মতো, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মতো, যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মতো, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোনো সুগন্ধও নেই' (ছহীহুল বুখারী, হা/৫০২০; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৭)। এখানে রাসূল ﷺ মানুষকে চার ভাগে

www.al-itisam.com

ভাগ করলেন। যার প্রথম দুই শ্রেণি হলো সৌভাগ্যবান, আর পরের দুই শ্রেণি হলো হতভাগা। অর্থাৎ যেই মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এবং যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, উভয়কেই রাসুল ﷺ সৌভাগ্যবানদের দলে শামিল করেছেন (মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ইবনুল কায়্যিম, ১/১৪৯)। কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো, তা বোঝা ও সেই অনুযায়ী আমল করা (তাফসীরুল মানার)। তবে কুরআন শিক্ষা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭)।

শিরক

প্রশ্ন (৪) : মাযারস্থ কবরস্থানে কোনো কিছু দান করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল মাহমূদ
বগুড়া।

উত্তর : না, মাযারস্থ কবরস্থানে কোনো কিছু দান করা যাবে না। বরং সেখানে দান করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা সেখানে দানকৃত অর্থ-সম্পদ শিরকী ও বিদআতী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৫) : অনেক মানুষকে দেখা যায় যে, যদি তাকে মসজিদ বা মাহফিলের সভাপতি বা প্রধান অতিথি করা হয়, তাহলেই সে দান করে, নইলে কোনো দান করে না। এমন ব্যক্তির দান কি কবুল হবে?

-আতিকুর রহমান
ময়মনসিংহ।

উত্তর : ইবাদত কবুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হলো, সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার লৌকিকতা ও সুনাম অর্জনের মনোভাব না থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত (সত্য) কোনো মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাকো, তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে' (মুমিন, ৪০/৬৫)। আবূ উমামা বাহিলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কী রয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তার জন্য কিছুই নেই'। তিনি তা তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য খালেছভাবে কৃত আমল যার মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, এমন আমল ব্যতীত কিছুই কবুল করেন না' (নাসাঈ, হা/৩১৩৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/৫২)। অতএব, মসজিদ বা মাহফিলের সভাপতি বা প্রধান অতিথি করার শর্তে সেখানে দান করলে উক্ত দান কবুল হবে না।

প্রশ্ন (৬) : আমি মাযারে একটি ছাগল দেওয়ার মানত করেছিলাম। পরে জানতে পারলাম যে, মাযারে মানত করা শিরক। এখন আমার করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এমন মানত পুরা করা যাবে না। কারণ এটা শিরক। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী বা অবাধ্যতার মানত করে, সে যেন তা না করে' (ছহীহুল বুখারী, হা/৬৭০০)। এমন মানত করার কারণে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'গুনাহের কাজে মানত করা যাবে না এবং এর কাফফারা হলো কসম ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ' (তিরমিযী, হা/১৫২৪)। আর কসমের কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করতে হবে অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করতে হবে অথবা একটি দাস মুক্ত করতে হবে। কিন্তু যার এগুলোর কোনোটিরই সামর্থ্য নেই সে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে (আল-মায়িদা, ৫/৮৯)।

বিদআত

প্রশ্ন (৭) : মীলাদুন্নবী উপলক্ষে মিছিলসহ যে সকল কার্যক্রম উদযাপিত হয় তার শারঈ বিধান কী?

-জিয়াউর রহমান
ফেনী।

উত্তর : এই সবগুলো কাজই বিদআত, যা অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ রাসূল ﷺ, তাঁর ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের যামানায় এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা শরীআতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৮) : অযূর সময় বিসমিল্লাহ বলার হুকুম কী? কেউ যদি অযূর সময় বিসমিল্লাহ না বলে, তাহলে তার অযূ হবে?

-সুমন আলী
জামালপুর।

উত্তর : অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে অযূ না করলে কারো ছালাত শুদ্ধ হবে না। সুতরাং সে তার মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে, মাথা মাসাহ করবে এবং উভয় পা গোড়ালীসহ ধুবে...' (আবূ দাঊদ, হা/৮৫৮)। এই হাদীছে রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহ বলার কথা বর্ণনা করেননি। সুতরাং এই হাদীছসহ আরো অন্য বর্ণনা প্রমাণ করে যে, অযূতে বিসমিল্লাহ বলা ফরয নয়, বরং তা সুন্নাত। অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলাই উত্তম। তবে কেউ যদি অযূতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহলে তার অযূ হয়ে যাবে (আল মাজমূ, ১/৩৪৬; শারহুল মুমতে, ১/১৩০)।

উল্লেখ্য যে, একটি হাদীছে রয়েছে, যে ব্যক্তি অযূতে বিসমিল্লাহ বলে না, তার অযূই হয় না (আবূ দাঊদ, হা/১০২, ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭)। এখানে উদ্দেশ্য হলো, বিসমিল্লাহ না বললে তার পূর্ণাঙ্গ অযূ হবে না। বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া অযূকে একেবারে নাকচ করা এখানে উদ্দেশ্য নয় (আল-মাজমূ, ১/৩৪৭; আল-মুগনী, ১/১৪৬)।

প্রশ্ন (৯) : অযূ করার পরে যদি অযূ ভঙ্গ হওয়া নিয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-আরিফুল ইসলাম
সিলেট।

উত্তর : অযূ করার পর অযূ ভেঙ্গে গেছে মর্মে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ অযূ ভঙ্গ হবে না। বরং সেই অযূতেই ছালাত আদায় করা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যার ছালাতে অযূ ভেঙ্গে গেছে মর্মে সন্দেহ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সে ব্যক্তি যতক্ষণ বায়ু নির্গমণের কোনো আওয়ায বা গন্ধ না পায় ততক্ষণ যেন সে ছালাত ছেড়ে না দেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৬১)। অর্থাৎ অযূ ভেঙ্গে গেছে এমন সন্দেহ নির্ভর হয়ে যেন ছালাত ছেড়ে না দেয়। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, সন্দেহের কারণে অযূ ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন (১০) : কাপড়ে ছেলে শিশু পেশাব করলে পানি ছিটিয়ে দিলেই ছালাত আদায় করা যায়। কিন্তু কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে পানি দিয়ে ধৌত করতে হয়। এর কারণ কী?

-আসাদুল হক
ময়মনসিংহ।

উত্তর : উক্ত মর্মে রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন বলেই তা পালন করতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/৩৭৬; নাসাঈ, হা/৩০৪)। তার কারণ জানা যাক আর নাই যাক। প্রত্যেক মুসলিমকে এমনই আক্বীদা পোষণ করতে হবে। মুআযাহ রহিমাহাল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে প্রশ্ন করলাম, ঋতুবতী মহিলা ছিয়াম কাযা করবে এবং ছালাত কাযা করবে না এটা কেমন কথা? আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, যখন আমাদের এরূপ হতো, তখন আমাদেরকে কেবল ছিয়াম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো, ছালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো না (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫)। তবে এর পিছনে হিকমত হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ছেলে শিশুর পেশাব চারিদিকে ছুটে যায়, তাই সেগুলো দূর করা কষ্টকর, তাই এখানে হালকা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মেয়ে শিশুর পেশাব এক জায়গাতেই পড়ে, তাই সে দূর করা তুলনামূলক সহজ। তাই সেটি ধৌত করার আদেশ করা হয়েছে। আবার ছেলে শিশুর পেশাবের চেয়ে মেয়ে শিশুর পেশাব বেশি গাঢ় ও বেশি দুর্গন্ধযুক্ত। তাই মেয়ে শিশুর পেশাব ধৌত করতে বলা হয়েছে আর ছেলে শিশুর পেশাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/৩১৫)।

ছালাত

প্রশ্ন (১১) : ফরয ছালাত আদায় করা অবস্থাতে বাবা, মা বা স্বামী যদি দরজা খোলার জন্য বাইরে থেকে ডাকে, তাহলে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দরজা খোলার জন্য ছালাত ভঙ্গ করা যাবে কি?

-রাবিয়া খাতুন
রাজশাহী।

উত্তর : ফরয ছালাত আদায় করা অবস্থায় কেউ যদি তাকে ডাকে, তাহলে ছালাত ভঙ্গ করে তার ডাকে সাড়া দিবে না, বরং ছালাত চালিয়ে যাবে। আর এক্ষেত্রে তার জন্য ছালাত হালকা করাও শরীআতসম্মত হবে। আবূ কাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে ছালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু শিশুর কান্নাকাটি শুনে ছালাত সংক্ষেপ করি, তার মায়ের কষ্ট

হওয়ার আশঙ্কায়' (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৭)। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, যেমন কোনো ব্যক্তি মারা যাচ্ছে বা পুড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি কোনো জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ছালাত ছেড়ে দিতে পারবে (আবূ দাঊদ, হা/৯২১)।

প্রশ্ন (১২) : আমাদের গ্রামে মুছল্লীদের মাঝে কোন্দল হওয়ার কারণে কিছু মুছল্লী ১০০ বা ২০০ মিটার দূরে ওয়াক্বফ করা সম্পত্তির উপর আরেকটি জামে মসজিদ তৈরি করে এবং তারা সেখানে জুমআ আরম্ভ করেছে। এমনটি করা কি শরীআতসম্মত হয়েছে?

-মাজিদুল ইসলাম
ভারত।

উত্তর : শরীআতসম্মত কারণ ব্যতীত পুরাতন মসজিদ থেকে আলাদা হয়ে পৃথক কোনো মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ এতে মুসলিমদের মাঝে ঐক্য নষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে। আর আল্লাহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না' (আলে ইমরান, ৩/১০৩)। কুফরীকে প্রতিষ্ঠিত করা, মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের সুযোগ দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে মুনাফিক্বরা মদীনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তাআলা তার রাসূল ﷺ-কে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করে দেন (তওবা, ৯/১০৭-১০৮)। সুতরাং কোন্দল করে পরে যেই মসজিদটি তৈরি করেছে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং সেই মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে আবার সকলকে একই মসজিদে ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১৩) : সুন্নাত ছালাতের কাযা আদায় করা যাবে কি?

-মো. রায়হান
যশোর।

উত্তর : হ্যাঁ, সুন্নাত ছালাতেরও কাযা আদায় করা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত (ফরযের পূর্বে) আদায় করতে পারেনি সে সূর্য উঠার পর তা আদায় করবে' (তিরমিযী, হা/৪২৩)। কুরাইব রহিমাহুল্লাহ উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আসরের পর দুই রাকআত ছালাত আদায় করলেন এবং বললেন, 'আব্দুল কায়স গোত্রের লোকেরা আমাকে যোহরের পরবর্তী দুই রাকআত ছালাত আদায় হতে (বিরত করে) মশগুল রেখেছিল' (ছহীহ বুখারী, ১/১২১)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যদি যোহরের পূর্বে চার রাকাআত না আদায় করতেন তবে যোহরের (ফরযের) পর তা আদায় করতেন (তিরমিযী, হা/৪২৬)। এই হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, সুন্নাত ছালাতেরও কাযা করা যাবে।

প্রশ্ন (১৪) : আমি একজন ব্যবসায়ী। সমস্যার কারণে জামাআতে প্রায় অংশগ্রহণ করতে পারি না; একাকী ছালাত পড়তে হয়। এতে কি আমার গুনাহ হবে?

-নূরুল হুদা
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

উত্তর : ব্যবসার কারণে জামাআত ত্যাগ করা কোনো ওযর নয়। বরং জামাআতে ছালাত আদায় করা আবশ্যক। ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে নবী ﷺ-কে তাঁর কাঠের মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছেন, 'লোকেরা অবশ্যই যেন জামাআত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে' (ইবনু মাজাহ, হা/৯৭৪)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অন্ধ লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই। অতঃপর তাকে বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন জানাল। তিনি ﷺ তাকে বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যে সময় লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ছালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নবী ﷺ বললেন, 'তাহলে তুমি মসজিদে এসে জামাআতে ছালাত আদায় করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩)। রাসূল ﷺ একজন অন্ধ ছাহাবীকেও জামাআত ত্যাগ করার ছাড় দেননি। সুতরাং অন্ধত্ব যদি জামাআত ত্যাগ করার ওযর না হয়, তাহলে ব্যবসা তো ওযর হতেই পারে না। তাই ব্যবসাতে ব্যস্ত থেকে জামাআত ত্যাগ করার কোনো অবকাশ নেই। বরং ছালাতের সময় হলে অবশ্যই মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথেই ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১৫) : মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে জুমআর দিন মসজিদে ক্ষীর, খুরমা, বাতাসা বিতরণ করা যাবে কি?

-আশিকুর রহমান
দিনাজপুর।

উত্তর : কেউ যদি মসজিদের মুছল্লীদের খাওয়ানোর জন্য মানত করে থাকে তাহলে তা বিতরণ করা যাবে এবং সকলেই খেতে পারবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোনো কাজের মানত করে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর যে তার অবাধ্যতামূলক কাজের মানত করে সে যেন তা পূর্ণ না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭০০)। আর যদি কোনো কল্যাণের আশায় ছাদাকা করে থাকে, তবে তা সবাই খেতে পারবে না। বরং তা ফকীর, মিসকীন, দরিদ্র বা অসহায় ব্যক্তিরা খাবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যখন কোনো খাদ্য আনা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, 'এটা হাদিয়া না ছাদাকা? যখন বলা হতো, এটা ছাদাকা। তখন তিনি না খেয়ে তাঁর ছাহাবীগণকে বলতেন, 'তোমরা খাও'। আর যখন বলা হতো হাদিয়া, তখন তিনি তাতে হাত দিতেন এবং তাদের সাথে খেতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৭৬)। তবে জুমআর পরে খাওয়া ও খাওয়ানোর স্থায়ী প্রচলন ঘটানো নতুন বিদআতের জন্ম দিতে পারে। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকাই উচিত।

প্রশ্ন (১৬) : যারা নগ্ন সিনেমা দেখে, তাদের ছালাত কবুল হবে কি?

-ফয়সাল হোসেন
ঢাকা।

উত্তর : যে কোনো ধরনের সিনেমা দেখা হারাম। কেননা এর মাধ্যমে চোখের, কানের যেনা হয়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিখে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয়ই করবে। চোখের ব্যভিচার হলো দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা (যৌন উদ্দীপক কথা বলা)। আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুপ্তাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৩; আবূ দাঊদ, হা/২১৫২)। তবে চোখের বা কানের যিনা থেকে বিরত থাকা, ছালাতের শর্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এমতাবস্থায় তার ছালাত কবুল হবে, কিন্তু নগ্ন সিনেমা দেখার কারণে সে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (১৭) : যদি মুসাফির ব্যক্তি জামাআতে স্থানীয় ইমামের সাথে চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাত এর এক রাকআত পায়, তাহলে ইমাম সালাম ফেরানোর পর সে কি আর এক রাকআত ছালাত আদায় করবে নাকি আরও তিন রাকআত ছালাত আদায় করবে?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : এক্ষেত্রে ইমাম সালাম ফিরানোর পরে মুসাফির ব্যক্তি তিন রাকাআত ছালাত আদায় করবে। কেননা মুকীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে তাকে পুরো ছালাতই আদায় করতে হয়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন ছালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে' (ছহীহুল বুখারী, হা/৬৩৬)। যেহেতু এক্ষেত্রে ইমামের সাথে ছালাত আদায়ে তিন রাকআত ছুটে গেছে, তাই মুসাফির ব্যক্তি ইমামের সালামের ফিরানোর পরে তিন রাকআতই আদায় করবে' (লিকাউল বাবিল মাফতূহ, ইবনু উছাইমীন, ১১৪/২৬)।

প্রশ্ন (১৮) : প্রচলিত আছে যে, জুমআর দিন চুপ থেকে খুৎবা শুনলে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাজার নেকী হয়। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-ইউসুফ
রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তবে জুমআর দিন মসজিদে গিয়ে সাধ্য অনুযায়ী ছালাত আদায় করে খুৎবার শেষ পর্যন্ত চুপ থেকে খুৎবা শুনলে এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ মধ্যেকার গুনাহ এবং আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ যদি জুমআর দিন গোসল করে মসজিদে আসে এবং সম্ভবপর কিছু ছালাত আদায় করে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে তাহলে তার দুই জুমআর মধ্যেকার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরো তিন দিন বেশি ক্ষমা করা হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৪)।

জানাযা

প্রশ্ন (১৯) : কেউ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে তার জন্য কি গোসল করা জরুরী?

-রুহুল আমীন
বগুড়া।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে গোসলদাতার জন্য গোসল করা সুন্নাত। তবে যদি কেউ গোসল না করতে চায়, তাহলে তার জন্য দুই হাত ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে তখন তোমাদের উপর গোসল করা জরুরী নয়। কেননা তোমাদের (মুসলিমদের) মৃত ব্যক্তি অপবিত্র নয়। সুতরাং তোমাদের হস্তদ্বয় ধুয়ে ফেলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে' (মুসতাদরাকে হাকেম, ১/৩৮৬, শায়খ আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাতাম অতঃপর আমাদের মধ্যে থেকে কেউ গোসল করত আবার কেউ গোসল করত না' (দারাকুত্বনী, হা/১৮৪২)।

প্রশ্ন (২০) : নারীদের জন্য জানাযার ছালাত ও মাটি দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করার বিধান কী?

-শামীমা আক্তার
নাটোর।

উত্তর : পর্দাসহ মহিলারা জানাযার ছালাতে শরীক হতে পারবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা সহ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য স্ত্রী মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৩)। তবে মহিলাদের কবরে মাটি দেওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জানাযায় অংশগ্রহণকে রেওয়াজে পরিণত করার প্রয়োজন নাই। পরিবেশ অনুযায়ী মিলে গেলে পড়তে পারে।

যাকাত

প্রশ্ন (২১) : আমার নানা মারা গেছে, তার কোনো ছেলে নাই, এমতাবস্থায় নানিকে কি যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে?

-মো. তরিকুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : না, দাদা-দাদি, নানা-নানিকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না। কেননা এমন ক্ষেত্রে তাদের ব্যয়ভার বহন করা এই নাতীর ওপর ফরয। আর যেসব নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করা ফরয তাদেরকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না (আল-মুগনী, ৪/৯৮)।

বিবাহ

প্রশ্ন (২২) : পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রীর কোন কোন অঙ্গ দেখা যাবে?

-আনোয়ার হক
রাজশাহী।

উত্তর : কোনো ছেলে যদি কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাহলে তার জন্য সেই মেয়ের চেহারা, হাত ও পায়ের পাতা দেখা বৈধ। সেই মেয়ের আরো কিছু দেখতে চাইলে উত্তম হলো, ছেলে তার মা বা বোনকে দেখানোর মাধ্যমে জানবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে তাকে বলল যে, সে আনছার সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি কি তাকে একবার দেখেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, 'যাও! তুমি তাকে এক নযর দেখে নাও। কারণ আনছারদের চোখে কিছুটা ত্রুটি আছে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২৪)। তবে শর্ত হলো, পাত্রীকে দেখতে গিয়ে ছেলে যেন তাকে নিয়ে নির্জনতা অবলম্বন না করে, বরং তার সঙ্গে তার কোনো মাহরাম পুরুষ (বাপ-ভাই) অবশ্যই থাকতে হবে। পিতা-মাতার উচিত হবে না তাদের কোনো এক রুমে একাকী ছেড়ে দেওয়া। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩৬)।

প্রশ্ন (২৩) : নাতনি বা পৌত্রীর সাথে কি তাদের নানা বা দাদার বিবাহ বৈধ?

-আব্দুল জাব্বার
কুষ্টিয়া।

উত্তর : নাতনী ও পৌত্রীর কাছে তাদের নানা ও দাদা পিতাস্বরূপ এবং নানা-দাদার কাছে তারা 'কন্যা' বা মেয়ে স্বরূপ। তাদের আপোসে বিবাহ বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ' (আন-নিসা, ৪/২৩)। এখানে কন্যা বলতে,

নিজের কন্যাও অন্তর্ভুক্ত এবং নিজের ছেলের বা মেয়ের কন্যাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নাতনী বা পৌত্রীকে বিবাহ করা জয়েয নয়।

প্রশ্ন (২৪) : একজন স্বামী তার স্ত্রীকে মা বলে যিহার করেছে। অতঃপর তাকে তালাক দিয়েছে। তাকে কি যিহারের কাফফারা আদায় করতে হবে?

-মাযহারুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যিহার হলো স্ত্রীকে এই বলা যে, তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো। ইসলামী শরীআতে কোনো ব্যক্তি যদি যিহার করে, তাহলে স্ত্রী সহবাস করার আগে তাকে কাফফারা দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, (তাহলে এর প্রায়শ্চিত্ত) একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তিদান। এর দ্বারা তোমাদের সদুপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন' (আল-মুজাদালা, ৫৮/৩)। কিন্তু কেউ যদি তার সেই স্ত্রীর সাথে সহবাসই না করে, বরং তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে আর কাফফারা দিতে হবে না।

প্রশ্ন (২৫) : বাবা-মা তার ছেলেকে এমন মেয়ের সাথে বিবাহ দিতে চায়, যেই মেয়ে ধার্মিক নয়। কিন্তু ছেলে চায় কোনো ধার্মিক মেয়েকে বিবাহ করতে। এক্ষেত্রে ছেলে কি বাবা মায়ের আদেশ মানবে নাকি তাদের অবাধ্যতা করবে?

-আলমগীর হোসেন
বরিশাল।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে ধার্মিক মেয়েকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়- তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯০)। তাই এই বিষয়টি বাবা মাকে বুঝানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তাহলে তাদের আদেশ অমান্য করায় শারঈ কোনো বাধা নেই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই' (শারহুস সুন্নাহ, হা/২৪৫৫)।

প্রশ্ন (২৬) : মোহর পরিশোধের পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে তার মোহরানার অর্থ কি মসজিদ বা মাদরাসায় দান করা যাবে?

-আরমান আলী
ঢাকা।

উত্তর : না, তার মোহরানার সম্পদ মসজিদ বা মাদরাসাতে দান করা যাবে না। বরং এই অর্থ সেই মহিলার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। অর্থাৎ তার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার ছেলে-মেয়ে ও পিতা-মাতা থাকলে তাদেরকে দিতে হবে (আন-নিসা, ৪/১১)। সেই অর্থ বণ্টিত হওয়ার পরে তারা যদি মসজিদ বা মাদরাসাতে দিত চায়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২৭) : এক ব্যক্তি রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দেয়। ফলে জনৈক মুফতী ছাহেবের শরণাপন্ন হলে তালাক কার্যকর হয়েছে মর্মে তিনি ফতওয়া দেন। তখন থেকে আজ প্রায় দুই বছর তারা সম্পূর্ণ পৃথক। বর্তমানে কি তারা পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারবে? যদি পারে তাহলে কি পুনরায় বিবাহ জরুরী?

-আনিসুর রহমান
কুষ্টিয়া।

উত্তর : এর পূর্বে যদি তালাক না হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে (আল-বাকারা, ২/২২৯)। আর যেহেতু মহিলার ইদ্দত পার হয়ে গেছে, তাই সেই মহিলা স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই অবস্থায় তারা নতুন মোহর দিয়ে আবার বিবাহ করার মাধ্যমে ঘর সংসার করতে পারবে (বুখারী, হা/৪৫২৯; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৭; সুনানুল কুবরা, নাসাঈ, হা/১০৯৭৪)।

প্রশ্ন (২৮) : চাচীকে বিবাহ করার হুকুম কী?

-লুকমান হোসেন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : চাচার সাথে যতদিন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ আছে, ততদিন তাকে বিবাহ করা যাবে না। কিন্তু কোনো কারণে যদি তাদের তালাক হয়ে যায় এবং সেই মহিলার ইদ্দত পার হয়, তাহলে তাকে বিবাহ করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। কেননা সূরা আন-নিসার ২৩ নং আয়াতে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে, চাচী তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্য চাচীর সাথে পর্দা করে চলতে হবে।

প্রশ্ন (২৯) : বিয়ের সময় মুকুট পরিধান করা বৈধ কি?

-আব্দুল কাইয়ুম
বগুড়া।

উত্তর : বিয়ের সময় মুকুট পরা মুসলিমদের কোনো রীতি নয়, বরং এগুলো অমুসলিমদের থেকে আগত বিষয়। তাই এগুলো

থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩০) : ডাক্তাররা রোগী দেখার সময় রোগীর নিকট থেকে যে ভিজিট নিয়ে থাকে, ইসলামী শরীআত এটা সম্পর্কে কী বলে?

-হুমায়ুন আহমেদ
ঢাকা।

উত্তর : ডাক্তার যদি কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে বেতনের বিনিময়ে চাকরি করেন, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডিউটিকালীন সময়ে রোগীর থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা ডিউটিকালীন সময়ে রোগী দেখার জন্যই তাকে বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু যদি ডিউটি টাইমের বাইরে রোগী দেখার জন্য কিছু টাকার শর্তারোপ করেন, তাহলে তাকে সেই টাকা দিতে হবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুসলিমদের একে অপরের সাথে সন্ধি স্থাপন করা জায়েয। কিন্তু বৈধকে অবৈধ অথবা অবৈধকে বৈধ করার মতো সন্ধি চুক্তি জায়েয নেই। মুসলিমগণ তাদের একে অপরের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মতো শর্ত বৈধ নয় (তা বাতিল বলে গণ্য হবে)' (তিরমিযী, হা/১৩৫২; ইবনু মাজাহ, হা/২৩৫৩)। তাছাড়া ছাহাবায়ে কেরাম এক সফরে ছিলেন। তখন উক্ত এলাকার গোত্রপতিকে বিচ্ছুতে দংশন করলে তারা ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে একপাল বকরীর শর্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটার বৈধতাও দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২২৭৬)।

তবে রোগীর আর্থিক অবস্থাভেদে ডাক্তারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো মানবিক দৃষ্টি রাখা। দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ছাড় দেওয়া বা ফি কম নেওয়ার অভ্যাস থাকাটা জরুরী। তা না হলে এই মহান পেশা মানবসেবা না হয়ে আত্মসেবার নামান্তর হবে।

প্রশ্ন (৩১) : মাহরাম পুরুষ কিংবা মহিলাদের সামনে একজন নারী কোন কোন অঙ্গ কতটুকু খোলা রাখতে পারে?

-শাকিলা খাতুন
নওগাঁ।

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে যেসব অঙ্গ মহিলারা সাধারণত খোলা রাখে যেমন- মুখমণ্ডল, দুই হাত কব্জি পর্যন্ত, দুই হাত কনুই পর্যন্ত, দুই পা ইত্যাদি এগুলো মাহরাম পুরুষের সামনে খোলা রাখা বৈধ। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অঙ্গগুলো মাহরাম পুরুষের সামনেও ঢেকে রাখতে হবে (ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১৭/২৯৭)। মাথার চুলও খোলা রাখা যায়। তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে মাথাও ঢেকে রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩২) : পবিত্র কুরআনে কি গান-বাজনা হারাম হওয়ার কোনো দলীল রয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য জ্ঞান ছাড়াই অসার বাক্য কিনে নেয় এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি' (লুকমান, ৩১/৬)। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই! এখানে অসার বাক্য দিয়ে উদ্দেশ্য হলো গান-বাজনা। অনুরূপভাবে ইবনু আব্বাস, জাবের, ইকরিমা, সাঈদ ইবনু যুবাইর, মুজাহিদ, মাকহূল, আমর ইবনু শুআইব, আলী ইবনু বাযীমাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে (ইবনু কাছীর, ৬/২৯৬)।

প্রশ্ন (৩৩) : কুরআন মাজীদ পুরাতন ও পড়ার অনুপোযোগী হলে করণীয় কী?

-রাকিবুল ইসলাম
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমত, কুরআন মাজীদের পুরাতন কপিটা পড়ার উপযোগী করতে চেষ্টা করতে হবে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই কপি দিয়ে উপকৃত হবে। আর যদি কোনোভাবেই সম্ভব না হয়, তাহলে এমন কপি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কেননা মূল কুরায়শী ভাষা আরবীতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। পরে অন্য উপভাষাতেও কুরআন পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাতে শব্দ ও মর্মগত বিপত্তি দেখা দিলে ৩য় খলীফা উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কুরআনের মূল কুরায়শী কপি রেখে বাকী সব কপি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বর্তমানে কেবল সেই কুরআনই সর্বত্র পঠিত হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৭-৪৯৮৮)।

প্রশ্ন (৩৪) : ছেলের রোগমুক্তির জন্য যদি কেউ ফকীর-মিসকীনকে একটি ছাগলের গোশত দিতে চায়, তাহলে কি সেই ছাগলের গোশত থেকে কিছু তারা নিজেরাও খেতে পারবে?

-মুরাদ হাসান
রংপুর।

উত্তর : না, সেই ব্যক্তি ও তার পরিবার খেতে পারবে না। কেননা এটি ছাদাকা। ছাদাকা ফকীর-মিসকীন, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের হক্ব। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ধনী এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য ছাদাকা হালাল নয়' (আবূ দাঊদ, হা/১৬৩৪)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'ছাদাকা হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭২)।

প্রশ্ন (৩৫) : আমি গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করি। এই কাজ করতে গিয়ে আমাকে মানুষ ও অনেক প্রাণির ছবি ডিজাইন করতে হয়। এমন কাজ করা কি আমার জন্য বৈধ হবে?

-নাজমুল হোসেন
পাবনা।

উত্তর : ইসলামী শরীআতে প্রাণির ছবি অঙ্কন করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা ছবি তৈরি করেছে কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা তৈরি করেছ তাতে জীবন দান করো' (ছহীহুল বুখারী, হা/৫১৮১; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৮)। সুতরাং প্রাণির ছবি অঙ্কনের কোনো কাজ করা যাবে না। নির্বোধ লোক ছাড়া সামান্য অর্থের জন্য পরকালে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাইবে না। তাই এসব কাজ বর্জন করতে হবে। তবে প্রাণির ছবি বাদে অন্যান্য জড়বস্তুর ছবি নিয়ে আঁকাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই (ছহীহুল বুখারী, হা/২২২৫)।

প্রশ্ন (৩৬) : হোমিও চিকিৎসা করা কি বৈধ? কেননা এতে এলকোহল মেশানো থাকে। অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টি জানাবেন।

-সিরাজুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর : কোনো ঔষধে যদি এমন পরিমাণ এলকোহল থাকে যে, সেটি বেশি খেলে নেশাগ্রস্থ হয়ে যাবে, তাহলে এমন ঔষধ খাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি বেশি খেলেও তাতে কোনো নেশা না আসে, তাহলে সেই ঔষধ সেবন করা বৈধ হবে। অর্থাৎ ওষুধে যদি এলকোহলের নেশাগ্রস্থ করার প্রভাবটা থাকে, তাহলে এমন ঔষধ খাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি নেশাগ্রস্থ করার এই প্রভাব না থাকে, বরং শুধু ঔষধকে সংরক্ষণ করার জন্য এলকোহল ব্যবহার করা হয়, তাহলে এমন ঔষধ সেবন করা বৈধ (লিকাউল বাবিল মাফতূহ, ইবনু উছাইমীন, ৩/২৩১)। আর হোমিও ঔষধ সাধারণত এমনই হয়ে থাকে, তাতে যেই এলকোহল ব্যবহার করা হয়, তাতে তার নেশাগ্রস্থ করার কোনো প্রভাব থাকে না, বরং সেই ঔষধকে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করার হয়। তাই হোমিও ঔষধ খাওয়াতে শরীআতে কোনো বাধা নেই ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন (৩৭) : হিন্দুদের দোকানে মিষ্টি ক্রয় করাতে শরীআতে কোনো বাধা আছে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত, মুসলিমদের যদি মিষ্টির দোকান থাকে, তাহলে সেখান থেকেই মিষ্টি কেনার চেষ্টা করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে যখন আহলে কিতাবদের পাত্রে খাবার খাওয়া যাবে কি-না এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'যদি অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করো' (ছহীহুল বুখারী, হা/৫৪৭৮)। আর যদি মুসলিমদের দোকান না থাকে, তাহলে হিন্দুদের দোকান থেকে মিষ্টি কিনতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের সাথেও লেনদেন করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৬১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯০)।

প্রশ্ন (৩৮) : সাংসারিক প্রয়োজন পূরণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে তার ব্যাপারে শরীআতের বিধান কী?

-আব্দুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর : সাংসারিক প্রয়োজন পূরণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে প্রকারান্তরে সে জাহান্নামের আগুন কামাই করে। কিয়ামতের দিন তার চেহারায় গোশত থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়, নিশ্চয় সে জাহান্নামের আগুন ভিক্ষা করে। সুতরাং সে তা কম করুক বা বেশি করুক' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৪১; ইবনু মজাহ, হা/১৮৩৮)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে হাত পাতে ক্বিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে উঠবে যে তখন তার মুখমণ্ডলে গোশত থাকবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৪০)।

প্রশ্ন (৩৯) : গরু, ছাগল ও মহিষের চিকিৎসা করে ও কৃত্রিম প্রজনন করিয়ে যে টাকা উপার্জিত হয় তা হালাল না হারাম?

-মোজাম্মেল হোসেন
রাজশাহী।

উত্তর : গরু, ছাগল ও মহিষের চিকিৎসা করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। কেননা দুনিয়াবী লেনদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো তা হালাল, যতক্ষণ না হারাম হওয়ার কোনো দলীল পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই যমীনে

যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত' (আল-বাকারা, ২/২৯)। আর এসব পশুর কৃত্তিম প্রজনন করিয়ে অর্থ উপার্জন করাতেও শরীআতে কোনো বাধা নেই। কেননা যেসব পশুর গোশত খাওয়া হালাল, সেগুলোর বীর্যও পবিত্র ও সেগুলো দিয়ে উপকৃত হওয়া যাবে এবং সেগুলো বিক্রি করাও জায়েয।

প্রশ্ন (৪০) : কেউ যদি হলুদ-মরিচের সাথে রং মেশানো চালের গুড়া বা কম দামের মরিচ মেশায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কম দামের পণ্য বেশি দামের পণ্য বলে বিক্রি করে এমন লোকের অধীনে চাকরি করে বেতন হালাল হবে কি?

-মো. মারুফ বিল্লাহ
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : ভালো পণ্যের সাথে নিম্নমানের পণ্য মিশিয়ে ভালো পণ্য বলে বিক্রি করা হলো প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামী শরীআতে সম্পূর্ণভাবে হারাম। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬)। কেউ যদি এমন প্রতারণা করে, তাহলে তার অধীনে থেকে এমন কাজে তাকে সহযোগিতা করা যাবে না। বরং সেই চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না (আল-মায়েদা, ৫/২)।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪১) : কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো ওয়ারিছকে কোনো সম্পদ দেওয়ার জন্য অছিয়ত করে যায়, তাহলে কি সেই অছিয়ত পূরণ করা যাবে?

-আব্দুস সালাম
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : না, এমন অছিয়ত পূরণ করা যাবে না। কেননা ওয়ারিছদের জন্য কোনো অছিয়ত করা বৈধ নয়। আমর ইবনু খারিজা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি এর ঘাড়ের নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। উষ্ট্রী জাবর কাটছিল এবং আমার কাধের মাঝখান দিয়ে এর লালা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাকে ﷺ বলতে শুনেছি, 'সকল হক্বদারের হক্ব আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়ত করা বৈধ নয়' (তিরমিযী, হা/২১২১; ইবনু মাজাহ, হা/২৭১২)।

প্রশ্ন (৪২) : নানির মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে আমার মা মারা গেছেন। এখন কি আমি আমার নানির সম্পত্তির ভাগ পাব?

-আবূ তাহের
চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : না, এমতাবস্থায় নাতি-নাতনীরা তাদের নানির সম্পত্তির ভাগ পাবে না। কেননা পিতা-মাতার মৃত্যুর পূর্বে সন্তান মারা গেলে সন্তানের সন্তানেরা অর্থাৎ নাতি-নাতনীরা নানা-নানি বা দাদা-দাদির সম্পদের ওয়ারিছ হবে না। বরং নানা-নানি বা দাদা-দাদিরাই তাদের সন্তানের সম্পদের ওয়ারিস হবে (আল-মুগনী, ৯/২২-২৩)। তবে এসব নাতী-নাতনীরা অসহায় হলে, নানা-নানির উচিত হবে তাদের জন্য অছিয়ত করা। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে মুসলিম ব্যক্তির অছিয়ত করার মতো কিছু সম্পদ রয়েছে, সে ব্যক্তির জন্য তার নিজের কাছে অছিয়তনামা লিখে না রেখে দুই রাত্রিও অতিবাহিত করার অধিকার তার নেই' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭)।

প্রশ্ন (৪৩) : পিতা যদি সন্তানদের মাঝে সম্পত্তি বণ্টনে কমবেশি করে তাহলে তার পরিণতি কী হবে?

-ইসাহাক আলী
নাটোর।

উত্তর : পিতা যদি সন্তানদের মাঝে বণ্টনে কমবেশি করে তাহলে তা যুলম বলে গণ্য হবে, যার জন্য কিয়ামতের দিনে তিনি দায়ী থাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (আন-নিসা, ৪/১৪)। আবূ বকর ইবনু আবী শায়বাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমাকে আমার পিতা তার সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করেন। আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না যতক্ষণ না আপনি রাসূল ﷺ কে সাক্ষী রাখেন। এরপর আমার পিতা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ এর নিকট আসেন, আমার দানের উপর তাকে সাক্ষী রাখার জন্য। রাসূল ﷺ তাকে বললেন এরূপ কাজ কি তুমি তোমার আর সব পুত্রদের সঙ্গে করেছ তিনি বললেন

না। নবী ﷺ বললেন আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার করো'। তখন আমার পিতা চলে আসেন এবং সে দান ফিরিয়ে নেন (ছহীহ বুখারী হা/২৫৮৭ ২৬৫০ ছহীহ মুসলিম হা/৪০৭৫ ৪০৭০)।

কসম

প্রশ্ন (৪৪) : কোনো ব্যক্তিকে যদি কসম করতে বাধ্য করা হয়, পরবর্তীতে সেই ব্যক্তি যদি কসম ভঙ্গ করে, এতে কি তার কোনো গুনাহ হবে?

-নাওশাদ হোসেন
রংপুর।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থাতে কসম বা যেকোনো কাজ করা হলে, সেই কাজের হুকুম প্রযোজ্য হয় না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে ভুল করা, ভুলে যাওয়া এবং জোরপূর্বক কৃত কাজের দায়ভার থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৫)। অতএব সেই কসম ভঙ্গ করলে তার কোনো গুনাহ হবে না।

হাদীছ

প্রশ্ন (৪৫) : 'সূরা ইখলাছ দশবার পাঠ করলে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে' মর্মে হাদীছটি কি গ্রহণযোগ্য? কেননা অনেক আলেম এটিকে যঈফ বলেছেন আবার কেউ কেউ এটিকে ছহীহ বলেছেন। তাই এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিস্তারিত জানতে চাই।

-হাবীবুল্লাহ খান
রাজশাহী।

উত্তর : সুনান দারেমীতে (২/৪৫৯) একটি সাঈদ ইবনুল মুছায়্যিব থেকে মুরসাল হিসেবে একটি বর্ণনা আছে। যেই সনদের একজন রাবী বাদে সকল রাবী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের রাবী। আর একজন রাবী শুধু ইমাম বুখারীর রাবী (সিলসিলা ছহীহা, ২/১৩৬-১৩৭)। ইমাম সুয়ূতী, ইবনু মাঈন, হাকিম রহিমাহুল্লাহ এদের মতে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহিমাহুল্লাহ-এর মুরসাল বর্ণনা হলো সবেচেয়ে ছহীহ মুরসাল বর্ণনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত (মিরআত, ৭/২৫৮)। তাই এই বর্ণনাকে শাহেদ হিসেবে বিবেচনা করে অত্র হাদীছকে শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ কমপক্ষে হাসান পর্যায়ের হাদীছ বলেছেন, আর এটিই সঠিক। আল্লাহু আ'লাম বিস ছওয়াব।

প্রশ্ন (৪৬) : 'কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সূরা মুলক পাঠ করলে ৪০ দিনের কবরের আযাব মাফ হয়' একথা কি সঠিক?

-মীজানুর রহমান
টাঙ্গাইল।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে সূরা মূলক সুপারিশ করবে মর্মে হাদীছটি ছহীহ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'কুরআনের মধ্যে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে যেটি কারো পক্ষে সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। এ সূরাটি হলো তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' (তিরমিযী, হা/২৮৯১)।

দু'আ

প্রশ্ন (৪৭) : 'মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফীহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা' এই আয়াতটি মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার সময় পড়া হয়। এটি কি সঠিক?

-জসিমুদ্দীন খান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : কবর দেওয়ার সময় উক্ত আয়াত পাঠ করার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। কবর দেওয়ার সময় উক্ত আয়াত পাঠ করা সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদে একটি বর্ণনা এসেছে (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৮৭), কিন্তু তা নিতান্তই দুর্বল। কেননা এই বর্ণনার সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর ও আলী ইবনু ইয়াযীদ নামক দুজন যঈফ রাবী রয়েছে। ফলে এই বর্ণনা আমলযোগ্য নয়। সুতরাং কবর দেওয়ার সময় উক্ত আয়াত পাঠ করা যাবে না। বরং কবর দেওয়ার সময় সাধারণ দু'আ হিসেবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটি দিবে।

প্রশ্ন (৪৮) : 'হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রব্বুল আরশিল আযীম' সকাল-বিকালে কেউ যদি এই দুআ সাতবার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সকল ধরনের দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন' মর্মে হাদীছটি কি আমলযোগ্য?

-ফাতেমা খাতুন
ঢাকা

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার, যা আমলযোগ্য নয় (আবূ দাঊদ, হা/৫০৮১; সিলসিলা যঈফাহ, হা/৫২৮৬)।

প্রশ্ন (৪৯) : বাড়ির সিড়িতে উঠার সময় আল্লাহু আকবার আর নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলা কি শরীআতসম্মত?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : উপরে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলা এবং নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলা সম্পর্কে যেই বর্ণনাগুলো এসেছে

সেগুলো সবই সফর সংক্রান্ত বর্ণনা। যেমন- জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমরা যখন কোনো উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতাম আর যখন কোনো উপত্যকায় অবতরণ করতাম, সে সময় সুবহানাল্লাহ বলতাম (ছহীহুল বুখারী, হা/২৯৯৩)। আবূয যুবাইর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, আলী আযদী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাকে জানিয়েছেন, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) তাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে বের হওয়ার সময় উটের পিঠে সোজা হয়ে বসে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন... (আবূ দাঊদ, হা/২৫৯৯)। কিন্তু বাড়িতে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপরে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলেছেন এবং নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ মদীনাতে তখন এমন দোতলা বাড়ি ছিল। যদি তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন আমল করতেন তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো ছাহাবী তা বর্ণনা করতেন। আর শরীআতের ক্ষেত্রে আসল হতো, দলীল না পাওয়া পর্যন্ত কোনো ইবাদত করা জায়েয নয়। তাই যেহেতু বাড়ির ওপরে উঠার সময় আল্লাহু আকবার ও নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলার পক্ষে কোনো স্পষ্ট দলীল নেই, তাই এমন আমল করবে না। বরং এই সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো শুধু সফরের সাথে খাছ থাকবে (লিকাউল বাবিল মাফতূফ, ইবনু উছাইমীন, ১০২/৩)।

প্রশ্ন (৫০) : নৌযানে আরোহণের সময় সূরা হূদের ৪১ নম্বর আয়াতটি পাঠ করার বিধান ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই?

-আবূ হানিফ বিন মর্তুজা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : নৌযানে আরোহণের সময় সূরা হূদের ৪১ নম্বর আয়াত পাঠ করা সম্পর্কে মুসনাদে আবী ইয়ালা (১২/১৫২) এর বর্ণনাতে জুবারাহ ইবনু মুগাল্লিস নামক মাতরূক রাবী রয়েছে আর আল-মুজামুল কাবীর (১২/১২৪) কিতাবের বর্ণনাতে নাহশাল ইবনু সাঈদ নামক মাতরূক রাবী রয়েছে। যেটি আমলযোগ্য নয়। সুতরাং এই আমল প্রমাণিত নয়। বরং বাহনে উঠার জন্য যেই দু'আ পাঠ করতে হয়, সেই দু'আই পাঠ করবে। অর্থাৎ নৌযানে উঠার সময়েও বলবে, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (আবূ দাঊদ, হা/২৫৯৯)।

"সম্পাদকীয়"-এর বাকী অংশ

কিন্তু দখলদার ইয়াহূদী জায়োনিস্টদের হাত থেকে বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার কোন পথে সম্ভব? এর সোজাসাপ্টা জবাব হচ্ছে, বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার করতে হলে মুসলিমদেরকে আগে দ্বীনী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ঈমান ও আমল পুনরুদ্ধার করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ ফিরে এসে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে, তাওহীদী দুর্গে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে হবে, আমলদার মুসলিম হতে হবে। জুমআর জামাআতে যত জন মুছল্লী হয়, ফজরের জামাআতেও তত জন মুছল্লী না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার স্বপ্নই থেকে যেতে পারে। যে ইসলামের উপর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন, শুধু সেই ইসলাম দিয়েই বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার সম্ভব। শুধু ইসলামের নাম দিয়ে বা আইডি কার্ডে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে এক ইঞ্চি জায়গাও জয় করা সম্ভব নয়। ফিলিস্তীন নামক ভূখণ্ডটি আরবদের নয়, বরং মুসলিমদের এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের— কেবল এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে অগ্রসর হতে হবে। আরব-অনারব বিভাজন রোধ করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে 'এক দেহ এক প্রাণ' হয়ে কাজ করতে হবে। মুসলিমদের সর্বাত্মক শক্তি বৃদ্ধির পথ খুঁজতে হবে *(আল-আনফাল, ৮/৬০)*। কেবল এই পদ্ধতিতেই মুসলিমরা দখলদার ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করে বায়তুল মাক্বদিস পুনরুদ্ধার করতে পারবে। আর তখনই নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বাণী সত্য প্রমাণিত হবে, 'ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই না করবে। মুসলিমরা তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইয়াহূদী আমার পেছনে। এসো, তাকে হত্যা করো। কিন্তু 'গারকাদ' গাছ এ কথা বলবে না। কারণ এ হচ্ছে ইয়াহূদীদের গাছ' *(মুসলিম, হা/২৯২২)*। লক্ষ করুন, হাদীছটিতে পাথর ও গাছ কর্তৃক ইয়াহূদীদের অনুসন্ধান দেওয়ার বাক্য হবে, 'হে আল্লাহর বান্দা! হে মুসলিম!' অর্থাৎ কেবল আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে খাঁটি মুসলিম হতে পারলেই বিজয় সম্ভব, অন্যথা নয়।

মহান আল্লাহ ইয়াহূদ ও তাদের দোসরদের অপবিত্রতা থেকে বায়তুল মাক্বদিসকে পবিত্র করুন। একে আবার মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তা পুনরায় আবাদ করার ব্যবস্থা করে দিন। আমীন! *(নি.স.)*

সূচিপত্র

...বাতুস সালাফ কর্তৃক প্রকাশিত

সিলসিলা ছহীহা!

(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)

সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিক্বহী ধারায় বিন্যস্ত

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

■ পৃষ্ঠা : ৫১২ ■ মূল্য : ৫০০ টাকা

ওহে সুন্নাহর অনুসারীগণ! পরস্পরের প্রতি কোমল হোন

আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন ইবনু হামাদ আল আব্বাদ আল বাদ্‌র হাফিযাহুল্লাহ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

■ পৃষ্ঠা : ১০৪ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

কুরআনের ধারক-বাহকদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আজুর্রী, আল-বাগদাদী (রাহি)

সংক্ষিপ্তকারক: ড. খালিদ ইবনু উছমান আস সাবত (হাফি)

অনুবাদ: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সম্পাদনা: আব্দুল আলীম ইবনে কাউছার মাদানী

■ পৃষ্ঠা : ৭২ ■ মূল্য : ৭০ টাকা

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য

আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

www.al-itisam.com

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

সূচিপত্র

নাজাতের একমাত্র অবলম্বন! সালাফী মানহাজের অনুসরণ!

সালাফী কনফারেন্স ২০২৩-২৪

সভাপতি

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বক্তব্য পেশ করবেন:
সালাফী মানহাজের অনুসারী
বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম

রাজশাহী	দিনাজপুর	নারায়ণগঞ্জ
৭ম বার্ষিক	৩য় বার্ষিক	৮ম বার্ষিক
২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৩	০২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪	৭ ও ৮ মার্চ ২০২৪
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ	স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ	স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
সময়: ১ম দিন বাদ আসর হতে	সময়: জুম'আর খুৎবার মধ্য দিয়ে	সময়: ১ম দিন বাদ আসর হতে

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

ব্যবস্থাপনায়: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫

সুখবর সুখবর

KULLIYATUL QURANIL KAREEM WADDIRASATIL ISLAMIYAH

كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

বিশুদ্ধ ধারার একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ভিশন : দক্ষ মুখলিস আলেম গঠন।

ভর্তি চলছে
আবাসিক/অনাবাসিক

সানাবিয়্যাহ (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য :

- মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডক্টরেট/ মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত স্কলার দ্বারা পাঠদান।
- আলিমের সিলেবাসের সাথে সমন্বয় করে সানাবিয়্যার সিলেবাস তৈরি।
- আরবি ভাষায় পড়া, লেখা ও বলার পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা।
- কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

"মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে"

সম্পূর্ণ অ্যারাবিক মিডিয়ামে সানাবিয়্যাহ-তে (আলিম)
আলিম সাধারণ বিভাগ
শুধু বালক

প্রতিষ্ঠাতা:
ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পি এইচ ডি, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

যোগাযোগ
০১৮৩৪ ১৭৭৭৬৫
০৯৬১০ ৯৯১৯৯
kulliyatulquran.com
kulliyatulquran
৯ ও ১৭, রোড: ৬/এ, সেক্টর: ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

www.al-itisam.com